দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ : ভবিষ্যতের ভাবনা
—পৃঃ ...১১

দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের আধিপত্য কায়েম করতে পাকিস্তানই সেরা সহযোগী হয়ে উঠেছে।
—পৃঃ ...২৯

৬৮ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ১৫ আগস্ট ২০১৬।। ৩০ শ্রাবণ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।। ১৫ আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

স্বাধীনতার ৭০ বছর পর

উন্নয়নের পথে

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ৩০ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৫ আগস্ট - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : খুনের প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করছেন মমতা ▯ সুন্দর মৌলিক **▯ ৯**

উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে কংগ্রেস এখন সাইনবোর্ড সর্বস্ব একটি দল ▯ গূঢ়পুরুষ **▯ ১০**

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ : ভবিষ্যতের ভাবনা ▯ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে আর মুখার্জি ও অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার রায় **▯ ১১**

উন্নয়নের দিশায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ▯ সুনীল দেওধর **▯ ২৪**

ভগবান তথাগতের মৈত্রীসেতু বনাম চীনের বিদেশ নীতি ▯ ২৭

দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের আধিপত্য কায়েম করতে পাকিস্তানই সেরা সহযোগী হয়ে উঠেছে ▯ ইন্দ্রাণী বাগচী **▯ ২৯**

জাতীয় জাগরণে রাখিবন্ধন ▯ প্রণব বর **▯ ৩১**

সংসদ ভবনের আদি প্রতিকৃতি মিতাওলি ▯ সৌমেন নিয়োগী **▯ ৩৩**

বন্দে মাতরম্ ও শ্রীঅরবিন্দ ▯ শেখর সেনগুপ্ত **▯ ৩৫**

হিন্দু পরম্পরায় বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন নেই : মোহনরাও ভাগবত ▯ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ৩৭-৩৮ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১

প্রকাশিত হবে
২২ আগস্ট, '১৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২২ আগস্ট '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নাগরিকত্ব বিল শরণার্থীদের রক্ষাকবচ

সম্প্রতি মোদী সরকার নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করেছেন। এই বিলটি আইনে পরিণত হলে তা হবে শরণার্থীদের রক্ষাকবচ। বাস্তবিক অর্থেই আইনটি হবে ঐতিহাসিক। এই বিষয় নিয়েই এবারে লিখেছেন ধর্মানন্দ দেব ও সন্দীপ চক্রবর্তী।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার রাজ্যের নাম বদলে উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, আর পশ্চিমবঙ্গ নয়, রাজ্যের নতুন নাম হউক বাংলা বা বঙ্গ বা ইংরাজিতে বেঙ্গল। স্বাধীনতার পর হইতে সাংবিধানিকভাবে এই রাজ্যের নাম ছিল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'। বাংলায় 'পশ্চিমবঙ্গ' বলা হইলেও সাংবিধানিক ক্ষেত্রে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামটিই ছিল স্বীকৃত। ইহার আগেও প্রথমবার ক্ষমতায় আসিয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্যোগ লইয়াছিলেন। সেই সময় এক সর্বদলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে রাজ্যের নাম হউক পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই প্রস্তাব পাঠানো হইলেও কেন্দ্র তাহাতে কোনোরকম ইতিবাচক সাড়া দেয় নাই। তাই পুনর্বার নাম বদলের সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বামফ্রন্টের আমল হইতেই এই বিষয়ে আলোচনা ও চর্চা হইতেছে।

রাজ্যের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে যুক্তি হইল, ইংরাজি বর্ণমালা অনুযায়ী 'West Bengal' নামের ডব্লিউ-এর স্থান তেইশ নম্বরে। তাই কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যের নাম অনেক পরে উচ্চারিত হয় অন্য রাজ্যগুলির তুলনায়। ইহার ফলে কেন্দ্রের কাছে দাবিদাওয়া, বিবেচনা তথা সাংবিধানিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় যাঁহারা বিবেচনা করেন, তালিকার নীচে থাকায় এই রাজ্যের আর্জি শোনার ক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে রাজ্য ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কেন্দ্রের দ্বারা বঞ্চিত হয়।

ইতিহাসের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে আমাদের এই রাজ্য খৃস্টপূর্ব দুই শতকের মৌর্য যুগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর সেন আমল পর্যন্ত বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। এই জনপদ সংলগ্ন অঞ্চলগুলির নাম ছিল অঙ্গ ও কলিঙ্গ। চতুর্দশ শতাব্দীর পর হইতে বাংলা নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার পর গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার এই অঞ্চল বেঙ্গল নামে পরিচিত হয়, যাহার বাংলা নামকরণ হয় বঙ্গদেশ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ পর্বে এই জনপদের পূর্ব অংশের নাম হয় পূর্ববঙ্গ। কিন্তু পশ্চিমাংশের নাম পশ্চিমবঙ্গ না হইয়া বঙ্গদেশই থাকিয়া যায়। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে পশ্চিমাংশের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া ড. শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু বাংলাভাষীদের জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠিত হয় এবং 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' নাম লইয়া ভারতের সঙ্গে থাকিয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

ঐতিহাসিক দিক হইতে দেখিলে পশ্চিমবঙ্গের নামটির সহিত অনেক ইতিহাস জড়িত। দেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যের নাম কেন পশ্চিমবঙ্গ হইল সেই প্রশ্ন প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যেই আসিবে। আর তখনই তাহারা জানিতে পারিবে ধর্মের দোহাই দিয়া দেশভাগের ইতিহাস। তাহাদের মনে এই প্রশ্ন ভবিষ্যতে যাহাতে আর না উঠে তাই জন্যই কি রাজ্যের নাম হইতে 'পশ্চিম'-কে মুছাইয়া ফেলিবার এই চেষ্টা? এই প্রসঙ্গে অনেকেই হয়তো পঞ্জাবের উদাহরণ তুলিয়া ধরিয়া বলিবেন—সেই রাজ্যের সঙ্গে তো কোনো দিকের নাম জুড়িয়া নাই। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উলটাইলে দেখা যাইবে পঞ্জাবের ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ জনবিনিময় হইয়াছিল। বাংলার ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু পূর্ব-পাকিস্তান ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেও এপার বাংলার অধিকাংশ মুসলমান কিন্তু দেশত্যাগ করে নাই। তাই পঞ্জাবের ক্ষেত্রে কোনো একটি দিকের নাম জুড়িয়া দেওয়ার প্রয়োজন না থাকিলেও বাংলার ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের নাম ইংরাজিতে যথাক্রমে নর্দান প্রভিন্স, সেন্ট্রাল প্রভিন্স। গ্রেট স্টেট নয়। তবে কেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল। ভাষান্তরের ক্ষেত্রে কি 'প্রপার নাউন' (Proper Noun) পরিবর্তিত হইয়া যায়? রাজ্যের ইংরাজি নাম যদি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর পরিবর্তে 'পশ্চিমবঙ্গ' করা হয় তবে কোনো জাতীয় স্তরের বৈঠকে এই রাজ্যের নাম এক ঝটিকায় পঞ্জাব, রাজস্থান, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড রাজ্যের আগে চলিয়া আসিবে। যদিও জাতীয় স্তরের বৈঠকে প্রত্যেক রাজ্যের জন্যই সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। যে সমস্যার কারণে রাজ্যের নাম বদলাইবার চেষ্টা, রাজ্যের নাম ইংরাজিতে 'পশ্চিমবঙ্গ' করিলেই তাহার সমাধান হইবে। তাই নাম বদল মানা যায় না।

সুভাষিতম্

ন মুক্তাভির্ন মাণিক্যৈঃ ন বস্ত্রৈর্ন পরিচ্ছদৈঃ।
অলঙ্কিয়েত শীলেন কেবলেন হি মানবঃ।।
মুক্তা, মাণিক্য অথবা পোশাকপরিচ্ছদে নয়, কেবল চরিত্রবলেই মানুষ বিভূষিত হয়।

কিছু সমাজবিরোধী শক্তি গো-রক্ষার নামে সমাজের সৌহার্দ্য নষ্ট করতে চাইছে : ভাইয়াজী যোশী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশের কিছু স্থানে কিছু সমাজ বিরোধীশক্তি গোরক্ষার নামে দেশের আইন নিজেরা হাতে তুলে নিচ্ছে এবং দেশে সৌহার্দ্যের পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ শ্রী সুরেশ যোশী উপাখ্য ভাইয়াজী যোশী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এভাবেই দেশের মানুষকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এর ফলে গো-রক্ষা ও গো-সেবার মতো পবিত্র কাজের প্রতি ভীতির উদ্রেক হতে পারে। তাই মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী লোকের এই নিন্দনীয় প্রয়াস থেকে গো-রক্ষার মতো পবিত্র কাজে যুক্ত দেশবাসীকে দূরে থাকতে হবে এবং তাদের আসল চরিত্র

সবার সামনে প্রকাশ করে দিতে হবে। রাজ্য সরকারগুলির প্রতিও শ্রীযোশী আবেদন জানান যে, এরকম নকল গো-রক্ষকদের প্রতি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং সত্যিকারের গোসেবার কাজে যেন বাধা দেওয়া না হয়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং ভারতীয় গোবংশ কৃষিকাজের ভিত্তিস্বরূপ। সারা বিশ্ব এখন রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বহুল প্রয়োগে বিপদগ্রস্ত। তাই গো-ভিত্তিক জৈব কৃষিকাজের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। এজন্য গোসেবা ও গোরক্ষা সম্পর্কে হিন্দু সমাজ এবং অন্য সমাজবন্ধুদের শ্রদ্ধাশীল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধীজী, আচার্য বিনোভা ভাবে এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এই পবিত্র কাজকে জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে করতেন।

ভারতে নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা এখনও নগণ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশে নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা মাত্র ৩৩,৩০৪ জন। এদের মধ্যে ১৭,৫৯৭ জন পুরুষ ও ১৫,৭০৭ জন মহিলা। সম্প্রতি প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা গেছে তথ্যটি। দেশের মধ্যে সর্বাধিক ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মানুষের বাস মহারাষ্ট্রে (৯,৬৫২ জন)। তারপর ক্রমান্বয়ে মেঘালয় (৯,০৮৯ জন), কেরল (৪৮৯৬ জন), উত্তরপ্রদেশ (২৪২৫ জন) এবং তামিলনাড়ু (১২৯৭ জন)।

ভারতে নাস্তিক্যবাদ কোনোদিনই সাধারণ মানুষের অনুমোদন পায়নি। তাই এই সেন্সাস রিপোর্ট নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাতে রাজি নন। কিন্তু একটি তথ্য সকলকে যথেষ্ট চমকে দিয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মাত্র ৭৮৪ জন! এদের মধ্যে গ্রামের বাসিন্দা ১০৬ জন (পুরুষ ৫৬, মহিলা ৫০) এবং শহরের ৬৭৮ জন (পুরুষ ৩৪৮ মহিলা ৩৩০)। সকলেরই কৌতুকভরা প্রশ্ন, এটা কীভাবে সম্ভব! ৩৪ বছরের বামশাসনে ধর্ম এবং আফিংয়ের সমীকরণে মেতে উঠেছিল বহু বাঙালি। যদিও প্রাক্তন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী নির্বাচনের আগে তারাপীঠে যেতেন, তার মুখে 'জয় তারা'ও অনেকে শুনেছেন, কিন্তু তাঁর এই অ-মার্কসীয় কাজকর্মের জন্য তিনি নিজের দলেই ছিলেন ব্রাত্য। বামপন্থীরা সাধারণত তাঁদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে নাস্তিক হন এবং শিল্পে-সাহিত্যে-সিনেমায় নাস্তিক্যবাদের প্রচারও করেন সুকৌশলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এত কিছু করেও পশ্চিমবঙ্গে নাস্তিকের সংখ্যা ৭৮৪ জনের বেশি হল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখন পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৮৬ জন। অর্থাৎ শতাংশের বিচারে নাস্তিক বাঙালি মাত্র ০.০০০৮৬ শতাংশ। বাম শিবির অবশ্য সমীক্ষার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাদের বক্তব্য, ধর্ম একান্তই মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকেই প্রকাশ্যে এ নিয়ে কিছু বলতে চান না। অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এই প্রবণতা বেশি। সারা বিশ্বে নাস্তিক্যবাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার নিরিখে ৭৮৪ জনের হিসাবটি তাদের কাছে বিভ্রান্তিমূলক। সমীক্ষার প্রশ্নমালা আরও বিশদে করা উচিত ছিল বলে তাঁরা মনে করছেন। সেন্সাস রিপোর্টের তথ্য যে বামপন্থীরা মানতে পারবেন না সেকথা বলাই বাহুল্য। বিভাগীয় মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই সমীক্ষায় রাখা হয়েছিল। ভারতবর্ষ চিরকালই ঈশ্বর বিশ্বাসীদের দেশ। আর বিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের পতন যে অনিবার্য তার প্রমাণ শুধু এই সেন্সাস রিপোর্ট নয়, ইতিহাসেও অজস্র রয়েছে।

চীনা টিভিতে আলোচনার ভিত্তিতেই বিরুদ্ধ মতকে নিকেশ করে দেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় টিভিতে আলোচনা বা সমকালীন আলোড়ন তোলা বা কোনো বিষয় নিয়ে হাড্ডাহাড্ডি বিতর্কসভা হলেই অনেকে মিডিয়া ট্রায়াল হচ্ছে বলে গলা ফাটান। এই তালিকায় বামপন্থীরা সামনের সারিতে আছেন। যদিও এখানে শেষমেষ চূড়ান্ত বিচার দেশের প্রচলিত আইনি পদ্ধতিতেই হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত এক চাঞ্চল্যকর তথ্য অনুযায়ী চীনা রাষ্ট্রপতি জি জিংপিংয়ের আদেশ অনুসারে চীনা টেলিভিশনের চ্যানেলগুলিতে আজকাল দেশের বহু উকিল ও মানবাধিকার কর্মীর উপস্থিতিতে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরার মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া ও রায়দান চলছে। চৈনিক রাষ্ট্রপতি দেশে উদারনৈতিক চিন্তা ভাবনা ও এই সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ বিলোপ করে দিতেই এই উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

চারজন অভিযুক্তের পক্ষে নিযুক্ত আইন বিশেষজ্ঞরা এই টিভি বিচার প্রক্রিয়াকে উদ্ভট ও জনতাকে ধোঁকা দিতেই চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। এই টিভি বিচারে দেখা গেছে— তথাকথিত অভিযুক্তেরা ভয়ে মুষড়ে পড়ে সরকারপক্ষের কাছে অপরাধ কবুল করে তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশবাসীকে কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্ভাব্য দুষ্ট শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার আবেদনও জানাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও বিচারসভায় তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হয়ে যথোপযুক্ত ভাবে দণ্ডিতও হয়ে যাচ্ছেন।

চৈনিক মানবাধিকার সংক্রান্ত সংস্থার তরফে গবেষক মায়া ওয়াং জানাচ্ছেন, একই সঙ্গে অভিযুক্তদের তরফে অপরাধ কবুল ও একই মুখে অজানা কোনো পক্ষের দলবিরোধী চক্রান্তের কথা স্বীকার করিয়ে শাসকদল দেশের অভ্যন্তরে নাগরিক সমাজের যে কোনো প্রতিবাদকেই অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাদের গলায় সেঁটে দেওয়া হচ্ছে দেশদ্রোহীর তকমা। এতে চীনা রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক ঢিলে দুই পাখি মারছেন।

অন্তর্ঘাতের অভিযোগে বিচার চীনে নতুন কিছু নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক বিচার প্রক্রিয়াগুলিকে এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জনতার নজরে আনার চেষ্টা একটা বড়সড় বদল। সরকার পরিচালিত চীনা প্রচারমাধ্যম ও অনুগত ওয়েবসাইটগুলিতে এই তথাকথিত বিচার সম্প্রচারের সময় দেশের অভ্যন্তরে পাশ্চাত্য প্রভাব ও উদারবাদী রাজনৈতিক মতবাদের বিস্তারের চেষ্টাকে তীব্র গালি গালাজ করা নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাম্প্রতি পরিসংখ্যান অনুযায়ী তথাকথিত দেশবিরোধিতার অভিযোগে ঝৌ শেফিং নামে এক আইনজ্ঞের ৭ বছর জেল হয়েছে। আর এর ব্যক্তির সরকার বিরোধী মতবাদ পোষণ করায় ওই ৭ বছর জেল ও মানবাধিকার কর্মী গেউ হঙ্গু ৩ বছর সাজা খাটবেন। যদিও আমাদের দেশের মার্কসবাদীরা 'কাশ্মীরের আজাদি' চেয়ে কানহাইয়াকে নিয়ে দিব্যি আছেন!

কানহাইয়াকুমারের নিরাপত্তারক্ষী তুলে নিল বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জে এন ইউ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি তাদের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের সভাপতি কানহাইয়া কুমারকে দেওয়া ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী ফিরিয়ে নিয়েছে। এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী কুমারকে একটি নোটিস দিয়ে জানিয়েছে এ যাবৎ তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া বাবদ ৫ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ হয়েছে। সেই টাকা চটজলদি ফেরত দিলে তবেই আবার নিরাপত্তার কথা ভাবা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত জে এন ইউ এস ইউ সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সৌরভ কুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লেখা এক চিঠিতে তাঁর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানান। এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতেই ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও আবেদনের সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই উপাচার্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। উপাচার্যের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিক গত বৃহস্পতিবার মধ্য রাতেই কানহাইয়ার নিরাপত্তারক্ষী প্রত্যাহার করে নেন। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উচ্চ পদাধিকারী বলেন, ''বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একজন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিতে কোনো অবস্থাতেই এত বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যথেষ্ট নিরাপদ আর রক্ষীরা সর্বত্রই নজর রাখছে।'' উল্লেখ্য, দেশদ্রোহিতার মামলায় জামিন পাওয়ার পর দিল্লী হাইকোর্টের আদেশে কানহাইয়াকে পুলিশি নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। সে সময় কানহাইয়াকুমার উপচার্যকে চিঠি লিখে জানান তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে পুলিশের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। তাঁর ইচ্ছানুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চারজন গ্রুপ ডি কর্মচারীকে সর্বক্ষণের জন্য মোতায়েন করেন।

ব্রহ্ম ক্ষেপণাস্ত্রের আধুনিকীকরণে কেন্দ্রের সুবজসঙ্কেত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ চীনের চোখ রাঙানির জবাব দিতে কেন্দ্র সরকার দেশের সেনাবাহিনীকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পার্বত্য এলাকার উপযোগী বিশেষ সমরসজ্জা তৈরি রাখার সবুজসঙ্কেত দিয়েছে। এর জন্য ৪৩০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে। আপাতত ঠিক হয়েছে ১০০টি ভূমি থেকে আকাশে আঘাত করতে সক্ষম ব্রহ্ম ক্ষেপণাস্ত্র, ৫টি ভ্রাম্যমান স্বয়ংক্রিয় লঞ্চার, ৫টি হেভি ডিউটি ট্রাক এবং একটি মোবাইল কম্যান্ড পোস্ট দিয়ে তৈরি হবে এই বিশেষ সমরসজ্জা। ব্রহ্ম ক্ষেপণাস্ত্র এখন ৭৫ ডিগ্রি কোণে ভূমি থেকে খাড়া শূন্যে উঠে আকাশের যে কোনো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে সেনাবাহিনীর বৈজ্ঞানিকেরা ক্ষেপণাস্ত্রটিকে আরও খাড়া ভাবে নিক্ষেপের গবেষণায় রত। কোণের পরিমাপ ৭৫ ডিগ্রি থেকে বাড়িয়ে ৯০ ডিগ্রি করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে মাথার ওপরে থাকা শত্রুবিমানকে ঘায়েল করা যায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য ধাপে ধাপে অনুদান বাড়িয়ে এই প্রকল্পে মোট ৩১০০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

উবাচ

"যদি চাও, আমাকে গুলি করো, দলিতদের নয়।"

গোরক্ষার নামে গুণ্ডাগিরি প্রসঙ্গে।

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

"অসম সরকার অসমের জনতার সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যারাই কোকরাঝাড় হামলায় জড়িত, তাদের ক্ষমা করা হবে না।"

কোকরাঝাড়ে জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গে।

সর্বানন্দ সোনোয়াল
অসমের মুখ্যমন্ত্রী

"সেখানে (বিধিবদ্ধ আইনে) কিছু অস্পষ্টতা আছে। কিন্তু দিল্লীকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার কোনো প্রস্তাব নেই।"

দিল্লীকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া প্রসঙ্গে।

টি কে বিশ্বনাথন
প্রাক্তন আইন সচিব
এবং লোকসভার
সেক্রেটারি জেনারেল

"অস্ত্র হাতে না তুলেও আর এস এস-বিজেপি কর্মীরা কেরলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।"

কেরলে সম্প্রতি আয়োজিত এক আলোচনা সভায়।

কিরেন রিজিজু
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র
প্রতিমন্ত্রী,

"একজন জঙ্গি কখনও স্বাধীনতা সংগ্রামী হতে পারে না। ...শুধু ভারতের স্বার্থে নয় বা সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির স্বার্থেও নয়, সমগ্র মানবতার স্বার্থে বলছি কোনো অবস্থাতেই একজন জঙ্গিকে শহিদ বানিয়ে মাথায় চড়াবেন না।"

বুরহান ওয়ানির মৃত্যুতে কাশ্মীরে বিক্ষোভ এবং তাতে পাকিস্তানের উস্কানি প্রসঙ্গে

রাজনাথ সিং
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

খুনের প্রমান লোপাটের চেষ্টা করছেন মমতা

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আর ঘটি-বাঙালের লড়াই নয়। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান যুদ্ধটা শুধু ময়দানেই থাকুক। এখন এক সঙ্গে লড়াই করার সময়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেনেশুনে একটি খুনের প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করছেন। এটাকে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে ভাবুন, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি সব বাঙালি।

পশ্চিমবঙ্গ নামটা বদলে বঙ্গ বা বাংলা বা বেঙ্গল হলে আপনারা খাওয়া পড়ার কোনও সমস্যা হবে না কিন্তু একটা খুনের ইতিহাস লোপাট হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ নামটি একটি স্মারক দেশভাগের। স্মারক বাঙালির খণ্ডিত অস্তিত্বের। বাঙালির স্বাধীনতা কোন কোন মূল্য চুকিয়ে এসেছিল, পশ্চিমবঙ্গ নামটি তারই প্রমাণ। দেশভাগের যন্ত্রণাও ইতিহাস। মানুষের শোকের আয়ু এখন মেরকেটে এক বছর। তাই ভাবনা হয়, অতীতের শোক ভুলে যাওয়া ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করবে না তো! হয়তো করবে না কিংবা করবে। তবে ইতিমধ্যেই 'পূর্ব পঞ্জাব' হয়ে গিয়েছে 'পঞ্জাব'। অর্থাৎ, দৃষ্টান্ত আছেই হাতের কাছে।

ইতিহাসনিষ্ঠ সভ্যতা ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করে। কিন্তু 'ঐতিহ্য' শব্দ বা কাঠামোমাত্র নয়। তার সঙ্গে জুড়ে থাকে সংস্কৃতি। সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ঐতিহ্যের রক্ষা অসম্ভব। আবার, ইতিহাসনিষ্ঠ সভ্যতা নেতিবাচক ঐতিহ্যও রক্ষা করে। জার্মানি এবং পোল্যান্ড তাই 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে'র ইতিহাস অস্বীকার করে না। তার নামেও পরিবর্তন ঘটায় না। নেতিবাচক সংস্কৃতিকে সামনে রেখেই অগ্রগমনের শপথ নেয়। শিকড়-বিস্মৃত হয়ে সভ্যতা এগোতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' কিংবা 'বঙ্গে' ফেরার যে প্রয়াস রাজ্য সরকার দেখাচ্ছে, তা আসলে ইতিহাস মুছে দেওয়ার প্রচেষ্টা।

রাজ্য সরকারের যুক্তিটি অবশ্য কেবল ইতিহাসনিবদ্ধ নয়। বরং প্রশাসনিক। 'ডব্লিউ' দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ইংরেজি নাম শুরু হওয়ায় কেন্দ্র-স্তরের সরকারি বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের সুযোগ আসে অনেক পরে। সেটাই নাম বদলে তালিকার উপরে উঠে আসার যুক্তি। তাহলে তো আদিবাংলা কিংবা আমার বাংলা করলেও হয়। আর এর পরে তালিকায় আরও পিছনে থেকে যাওয়া কোনো রাজ্য নামবদল করে নিতে পারে। দেশে তখন দেখা যাবে নামবদলের লড়াই। তালিকার উপরে ওঠার লড়াই। উন্নয়নের মাধ্যমে উপরে ওঠার লড়াই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ভারতের পূর্বে অবস্থিত রাজ্যটির নামে সঙ্গে 'পশ্চিম' জুড়ে যাওয়ার স্মৃতি আনন্দের নয়। বঙ্গভাগের বেদনা জুড়ে আছে এ নামে। জুড়ে আছে দেশভাগের যন্ত্রণাও। ঐতিহাসিক কাল থেকে বিশাল দেশের পূর্বস্থ ভূখণ্ডটি 'বঙ্গদেশ' নামেই পরিচিত ছিল। যদিও সময়ে সময়ে তার ভৌগোলিক সীমানা বদলেছে। একসময় বিহার, ওড়িশাও বাংলার অংশ ছিল। দেশভাগের আগে অঙ্গ ছিল এখনকার বাংলাদেশও। দ্বিজাতি তত্ত্বে সেই 'বঙ্গ' ভেঙেই 'পূর্ব' এবং 'পশ্চিম'। একুশ শতকে পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে পুরনো বঙ্গের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সরকার উদ্যোগী। কিন্তু তাতে অবিভক্ত বঙ্গের ঐতিহ্য রক্ষিত হবে বলে প্রত্যয় হয় না। ভেঙে যাওয়া বাংলার ভূগোলটি ফেরানো যাবে না। সেদিক থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটি রেখে দেওয়ার যুক্তিই শক্তিশালী। বেদনার হলেও 'পশ্চিম' শব্দটি দেশভাগের ইতিহাস বহন করে। হয়তো বহন করে রাজনৈতিক ভূগোলের ইতিহাসও। মনে করিয়ে দেয় আজকের পশ্চিমবঙ্গকে এখনকার চেহারায় রাখার জন্য এক বাঙালি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের কথা।

রাজ্যের যা অবস্থা তাতে এখন ভাবতে হবে, নামের বদল, না বদনামের কলঙ্ক মোচন, কোনটি আশু কর্তব্য! নাম বদলে হয়তো তালিকার উপরে ওঠা যাবে। কিন্তু সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার না-হলে 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' লুটোপুটি খাবে তালিকার শেষেই! নিঃস্ব বাংলা কোনো দিনই মমতার মুখে ছাড়া বিশ্ববাংলা হতে পারবে না।

মনে রাখবেন, বঙ্গভঙ্গ রোধ করার পরাধীন যুগের লড়াইয়ের কথা। সেই সম্ভাব্য খুনকে মেনে নিতে পারেননি তাঁরা। তবু খুনটা হয়েছিল। রক্ত ঝরেছিল বাংলা মায়ের। এখন পশ্চিম শব্দটি লোপাট করে দেওয়া আসলে সেই খুনের প্রমাণ লোপাটেরই চেষ্টা। ভারত সরকার কি এমন অন্যায় কাজকে মেনে নেবে? দেশভাগের কাঁটা বিদ্ধ বাঙালি?

—সুন্দর মৌলিক

উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে কংগ্রেস এখন সাইনবোর্ড সর্বস্ব একটি দল

গত সপ্তাহ লিখেছিলাম যে আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই পাঁচ রাজ্যে বিজেপি সাফল্য পেলে রাজ্যসভায় বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। এখন রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সংসদে বিল পাশ করাতে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল বিজেপিকে পদে পদে বাধা পেতে হচ্ছে। এইভাবে কেন্দ্রে সরকার চালানো যায় না। যেভাবে সাধারণ পণ্য পরিষেবা বিল পাশ করাতে মোদী সরকারকে কংগ্রেস ব্ল্যাকমেল করেছে সেভাবে প্রশাসনকে সচল রাখা সম্ভব নয়। তাই পাঁচ রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে জিততে বিজেপিকে কোমর বেঁধে লড়তে হবে।

পাঁচ রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিধানসভায় মোট আসন ৪০৩টি। গত ২০১২ সালের সর্বশেষ বিধানসভার নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল। মুখ্যমন্ত্রী হন মুলায়ম-পুত্র অখিলেশ যাদব। বিপুল জনাদেশ পাওয়ার পরেও অখিলেশ যাদব প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ হয়েছেন। জমি মাফিয়া, নারীধর্ষণ, সাম্প্রদায়িকা দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রতিরোধে বর্তমান সমাজবাদী পার্টির সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে স্বয়ং মুলায়ম সিং যাদব তাঁর পুত্রকে সতর্ক করতে বাধ্য হয়েছেন। সাম্প্রতিক বুলন্দশহর গণধর্ষনকাণ্ডে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে উত্তরপ্রদেশে এখন সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য চলছে। নিঃসন্দেহে, রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলার অবনতি প্রধান বিষয় হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনও বলেছে যে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে ঘুষ, সমাজবিরোধী ক্রিমিনালদের অস্ত্রহাতে দাপাদাপি এবং পেড নিউজ এই তিনটির মোকাবিলা করাই হবে কমিশনের প্রধান দায়িত্ব।

অখিলেশ যাদব মন্ত্রীসভার মেয়াদ শেষ হয়েছে আগামী বছরের মে মাসে। তার

গূঢ়পুরুষের কলম

আগেই উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন শেষ করতে হবে। সম্ভবত সাত বা আট দফায় ভোট গ্রহণ করা হবে। এই নির্বাচনে চারটি প্রধান রাজনৈতিক দল হচ্ছে— সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি, বিজেপি এবং কংগ্রেস। এই চতুর্দলীয় লড়াইতে শেষ হাসি কে হাসবে সেটাই দেখার। তবে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত সমীক্ষা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে মূল লড়াইটা হবে মায়াবতীর বহুজন সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে বিজেপির। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিজেপির সভাপতি কেশব প্রসাদ মৌর্য অবশ্য এই তত্ত্বটি মানতে চাননি। তাঁর মতে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে বিজেপির। এবং পরিণামে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্য সরকার গড়বে। কিন্তু কেশব প্রসাদের দাবি মানতে নারাজ সংবাদমাধ্যমের জনমত সমীক্ষার রিপোর্ট। এবিপি নিউজের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আগামী বছরের বিধানসভার নির্বাচনে বহুজন সমাজবাদী পার্টি পেতে পারে ১৮৫টি আসন। অর্থাৎ, বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে থাকতে পারে। আসন সংখ্যার সামান্য হেরফের হলেও মোটামুটিভাবে একই কথা বলা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের উপর করা সমস্ত সমীক্ষায়। বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের রাজ্য বিজেপিতে শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাবেই দল প্রথম স্থানটি দখল করতে পারবে না। তা ছাড়া, রাজ্যের অন্য তিনটি দল তাদের মুখ্যমন্ত্রীর নাম জানালেও বিজেপি দলীয় কোন্দলের জন্য নির্বাচনের আগে দলের প্রধান মুখটি কে তা বলতে পারেনি। গত লোকসভার নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীকে দলের মুখ হিসাবে প্রচার করে বিজেপি যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছিল। বিজেপির সাফল্য নির্ভর করে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও দলিতদের সমর্থনের উপর। কিন্তু নানা কারণে দলিতরা এবার তেমনভাবে বিজেপির সঙ্গে নেই। দলিত ভোট ভাঙলে বিজেপির পক্ষে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা দখল কঠিন হবে।

রাজ্যের সব জনমত সমীক্ষায় বহুজন সমাজবাদী পার্টি এগিয়ে আছে। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে যে রাজ্যের প্রায় ২০ শতাংশ মুসলমান ভোট মায়াবতীর দিকে ঝুঁকে আছে। উৎসাহিত মায়াবতী তাই ঘোষণা করেছেন যে তিনি এবার ১০০ জন মুসলমান প্রার্থী দিচ্ছেন। দলিত ও মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের কাঁধে চড়ে মায়াবতী আবার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার আশায় রয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির সমর্থনে একমাত্র রাজ্যের যাদবরা ছাড়া তেমনভাবে আর কেউ নেই। দুর্বৃত্তদের দাপাদাপি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণামে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় অখিলেশ যাদবের সরকারের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কংগ্রেসের।

বর্ণ হিন্দু, মুসলমান, ওবিসি ভোটাররা কেউই কংগ্রেসকে বিশ্বাসযোগ্য দল বলে মানেন না। উত্তরপ্রদেশে ধর্ম এবং জাতপাতের মেরুকরণে কংগ্রেসের স্থান নেই। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে কংগ্রেস এখন অস্তিত্বহীন সাইনবোর্ড সর্বস্ব একটি দল। যে দলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

১৫ই আগস্ট

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ : ভবিষ্যতের ভাবনা

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে. আর. মুখার্জি (অবঃ)
ও
অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার রায়

অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে উদ্ভূত ঘটনাবলী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দীর্ঘকাল বিপর্যস্ত রেখেছে। কিন্তু এই অঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ার জন্য দায়ী রাজনৈতিক নেতাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সঙ্কটের কারণ বহুবিধ, কিন্তু এর মূল উৎস এই অঞ্চলের সামাজিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল— রাজ্যগুলি এই প্রবন্ধে আলোচ্য (সিকিম নয়, কারণ এই রাজ্যগুলি থেকে সিকিমের পার্থক্য গভীর, যদিও সরকারি ভাষ্যে সিকিম উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)। এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমানার দৈর্ঘ্য ৫১০০ কিমি। প্রায় ৩ লক্ষ বর্গকিমি এলাকায় জনসংখ্যা ৪৫ মিলিয়ন (২০১১ সালের গণনা অনুসারে)। শিলিগুড়ি অলিন্দ নামে অভিহিত একটি অতীব অপ্রশস্ত এলাকা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একমাত্র যোগসূত্র। পাহাড়-পর্বত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭০ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে; প্রধানত অরণ্যে আবৃত এই এলাকায় অনেকগুলি বড় নদী প্রবাহিত এবং গভীর খাদও বিদ্যমান। পর্বতমালা পরিবৃত এই নদীগুলি বিভিন্ন উপত্যকার ভৌগোলিক পার্থক্য নির্দিষ্ট করে এবং উপত্যকাগুলির স্বকীয়তা নিশ্চিত করে। স্বভাবতই উপত্যকাবাসী বিভিন্ন জনজাতি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। আবহমানকাল উপত্যকাগুলিই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভিবাসীদের আগমন পথ হিসেবে কাজ করেছে। উপরন্তু, উপত্যকায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতি তাদের আত্মপরিচিতির অনন্যতা সংরক্ষণে এতটাই মগ্ন যে তাদের আদিম মূল্যবোধই তাদের উজ্জীবিত রেখেছে : সেটি হলো 'আমার জনজাতি, আমার জমি, আমার স্বশাসন'। ফলে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত প্রায় অবিরাম।

জনসমাগম ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল অবস্থান হিসেবে শিলিগুড়ি অলিন্দ ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমতলভূমি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র, আর পার্বত্য এলাকাগুলি প্রান্তবর্তী। কিন্তু উপত্যকাগুলির জমি উর্বর এবং প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত। ভারতে উৎপাদিত চা-য়ের ৫০ শতাংশ ও পেট্রোলের ২০ শতাংশ এখানেই পাওয়া যায়। এখানকার ইতিহাস প্রমাণ করে যে এই এলাকাগুলির বিশাল বনসম্পদ, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের বিপুল ভাণ্ডার অভিবাসনকামী ও আক্রমণকারীদের আকৃষ্ট করেছে। তারা গিরিপথ ও নদীউপত্যকা ব্যবহার করে এই অঞ্চলে এসেছে। ফলে এই অঞ্চলে সংস্কৃতি ও জাতিগোষ্ঠীর বর্ণময় ও সমৃদ্ধ সংমিশ্রণ ঘটেছে। এশিয়ার উচ্চতর অঞ্চল এবং ইন্দো-চীন ও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমির মধ্যে গমনাগমনের দ্বার

হওয়ায় এবং বহু জাতিগোষ্ঠীর আবাসস্থল হিসেবে গড়ে ওঠায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল একটি বিশেষ স্বকীয়তা অর্জন করেছে।

অরুণাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং ভুটানের কিছু অংশ চীন নিজস্ব বলে দাবি করেছে। সিকিমের সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারেও চীন আপত্তি তুলেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে সমর্থন দিয়ে চীন ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ পরিচালনা করছে। সেজন্য এই অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যাপকহারে নিয়োজিত রাখা হয়। পাকিস্তান বিভাজন ও বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে ও প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অধিকার স্থাপনে প্রয়াসী ছিল। এজন্য অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। নীরব তথা নিরন্তর অভিবাসন/অনুপ্রবেশ মারফত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসংখ্যার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনা হয়। আশা ছিল, একদিন ওই অঞ্চল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিবেশি দেশের রাজনৈতিক আনুগত্য স্বীকার করবে। এই উদ্দেশ্যে, শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পরে, বহু বৎসর চীন ও পাকিস্তানের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধে ব্যস্ত থাকে। ভারতের উত্তর- পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্যের মাধ্যমে ওই অঞ্চলে ও স্বদেশে বাংলাদেশ ইসলামি জঙ্গিবাদ প্রচার করে। তবে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন মোটামুটি ভালো। কিন্তু ভারত ও চীনের ইউনান প্রদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে মিয়ানমারের নিয়ন্ত্রণ নিতান্তই নগণ্য। বাস্তবে, দীর্ঘকাল বিদ্রোহ এবং চীনের হানগোষ্ঠীর বিপুলহারে বসতিস্থাপনের ফলে মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চল প্রায় চীনের উপনিবেশে রূপান্তরিত হচ্ছে। এটা অবশ্যই ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। উপরন্তু, উত্তরপূর্ব ভারতের ও মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি একত্রে মিয়ানমারকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। উত্তর মিয়ানমার আবার চীন, থাইল্যান্ড, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও তৎসংলগ্ন সাগরাঞ্চল পর্যন্ত উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। উত্তরপূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রভাব বিস্তারের জন্য এই প্রবেশদ্বারের গুরুত্ব সহজবোধ্য।

উত্তরপূর্ব ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক বা মন-খম গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এরা বিহার ও আন্দামানের মুন্ডাদের সগোত্র এবং এখন প্রধানত খাসী-জয়ন্তীয়া-অধ্যুষিত মেঘালয়ে এবং কারবি আংলং-য়ে বসবাস করে। অল্প কিছু দ্রাবিড় ও নেগ্রিটো গোষ্ঠীর উপস্থিতিও লক্ষণীয়।

বিপুল সংখ্যক মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ খৃষ্টপূর্ব কয়েক হাজার বৎসর ধরে দফায় দফায় ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে অভিবাসী হয় ও কর্তৃত্ব স্থাপন করে। তারা উত্তর ভারত ও নেপালের কিয়দংশে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আমরা সিকিমে লেপচাদের, উত্তরবঙ্গে কামতাপুরি- কোচদের, অসমে বোড়ো-কাচারী এবং ডিমাসা-চুতিয়া- মারান-রাজবংশীদের, মেঘালয়ে গারো পাহাড়ের গারোদের, মণিপুরের মাইতাই উপজাতি, ত্রিপুরার ত্রিপুরী, ভুটানের বোড়ো গোষ্ঠী, অরুণাচলের আকা, আদি, মিশমি ইত্যাদি কতিপয় উপজাতিদের এবং বর্তমানকালের কিছু নাগা উপজাতির উপস্থিতি লক্ষ্য করি। অতএব, নাগাদের মতো কিছু উপজাতিদের দাবি যে তারাই ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের আদিম অধিবাসী, এটা সত্য নয়। কিছু উপজাতি আবার যে বিশাল কামরূপ সাম্রাজ্য স্থাপন করে তা বিহার, বঙ্গ, ওড়িশা, অসমের সমতলভূমি এবং উত্তরপূর্ব ও পূর্বভারতের কয়েকটি পার্বত্য এলাকায় বিস্তৃত ছিল।

আর্যসভ্যতা পূর্বদিকে অসমের সমতল-ভূমির নিম্ন বা পশ্চিমাংশে বিস্তৃত হলে বৈদিক ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। এছাড়া, নাগাল্যান্ড, অসমের ঊর্ধ্বাংশ, অরুণাচল, মিজোরাম, দক্ষিণ মণিপুর, ত্রিপুরা ও সিকিমে তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠী, মিজো-কুকি-চীনা উপজাতি ও কিছু নাগা উপজাতির অভিবাসন ঘটে। ইতিমধ্যে আর্য সংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট স্বাধীন সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে মণিপুর ও ত্রিপুরায়। তুর্কী-আফগান সুলতানেরা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অসম বিজয়ের অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশ থেকে অভিযান পরিচালনা করে। বার বার পরাজয়ের ফলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু আক্রমণকারী মুসলমানদের অনেকে অসমের নিম্ন অংশে ও কোচবিহারে বসতি গড়ে তোলে। তাদের বংশধরেরা আজও বিদ্যমান। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আহোম গোষ্ঠী অসমের ঊর্ধ্বাঞ্চলে হানা দেয়। আহোমরা প্রকৃতপক্ষে চীনের ইউনান অঞ্চলের শান উপজাতির অন্তর্গত। এই উপজাতি মিয়ানমারেও অতীতে অভিবাসী হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই অহোমরা অসমে কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং তাদের শাসন ছয়শত বৎসর স্থায়ী হয়। তবে বোড়ো গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ছিল বিরামহীন।

ষোড়শ/সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগলরা অসমের নিম্নাঞ্চল আক্রমণ করে এবং প্রায় সত্তর বৎসর অসমের মধ্য ও নিম্নাঞ্চলে কর্তৃত্ব বজায় রাখে। পরবর্তীকালে আহোমরা মোগলদের বিতাড়িত করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে অসমের প্রায় সর্বত্র আহোমদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলের উপজাতিদের পর্যুদস্ত করা সম্ভব হয়নি। আহোম ও বোড়োদের এলাকাগুলিতে এই উপজাতিরা ঘন ঘন উপদ্রব করত। কঠোর শাস্তিমূলক অভিযানেই এই উপজাতিদের নিবৃত্ত রাখতে হোত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আহোম শাসকেরা

স্থানীয় বৈষ্ণবদের ওপর উৎপীড়ন করলে বৈষ্ণবদের প্রতিরোধ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র আহোম সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হয়। আহোম রাজা বর্মী রাজার কাছে সাহায্যের আবেদন করে। বর্মী সেনারা অতি সত্বর সাড়া দিলে আহোমরা বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আহোমদের কুশাসনের ফলে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। পুনরায় আহোমরা বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে বর্মীদের আহ্বান করে। ফলে, দুই বৎসর আহোম রাজত্ব বর্মীদের দখলে থাকে। একই সময়ে মণিপুরীদের সঙ্গে এলাকা দখল ও বশ্যতা-জ্ঞাপক কর আদায়ের ব্যাপারে যুদ্ধ চলে।

নেপালের গোর্খারা বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলগুলি জয়ের চেষ্টা করে। ফলে, ১৮১৫-১৬ সালে ইঙ্গ-গোর্খা যুদ্ধ হয়; গোর্খারা পরাজিত হয়। অতঃপর বৃটিশ সেনাবাহিনী গোর্খাদের সৈনিক হিসেবে নিয়োগ করে, যাতে তাদের সহায়তায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপন করা যায়। এজন্য ওই অঞ্চলের সর্বত্র গোর্খা সেনাদের নিযুক্ত করা হয়। ভবিষ্যতে এদের অনেকেই ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে; বংশবৃদ্ধিও ঘটে।

বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া ও চীন থেকে বিপদের আশঙ্কায় বৃটিশরা অগ্রসরমূলক নীতি অনুসরণ করে তিব্বত, নেপাল, ভুটান ও সিকিমকে পরাভূত করে তাদের বৃটেনের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করে। এভাবে ভারতের উত্তরে একটি সংঘর্ষ-নিয়ন্ত্রক এলাকা গড়ে তোলা হয়। নাগা-মিজো পাহাড়ি এলাকায় বৃটিশরা সীমিত স্বশাসন এবং অভ্যন্তরীণ সীমারেখা (ইনার লাইন) ব্যবস্থা প্রচলিত করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গবিভাগ ও অসম পূর্ববঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বিপুলসংখ্যক মুসলমান পূর্ববঙ্গ থেকে অসমে বসতি স্থাপন করে। ১৯৩৫ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করার পর এবং সাদুল্লা অসমে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে অসম, উত্তরবঙ্গ ও ত্রিপুরায় মুসলমান অভিবাসন অধিকতর বৃদ্ধি পায়। মুসলমানরা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ শতাংশে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অভিবাসন চলতে থাকে। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ঠিক পূর্বে অভিবাসীদের সংখ্যা এক কোটিতে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে ১৯৭১-এর দশকে অসমে আন্দোলনের ফলে অভিবাসন হ্রাস পায়, কিন্তু বন্ধ হয়নি। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উৎপীড়িত হিন্দুদের আগমনের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। ফলে দীর্ঘকাল ত্রিপুরায় উপজাতিদের চরমপন্থী আন্দোলন চলে। আবার নেপালিদের প্রবেশের ফলে সিকিমে নেপালিরা সংখ্যাধিক্য লাভ করে; অতীতে লেপচা-ভুটিয়ারা সিকিমে সংখ্যাগুরু ছিল। প্রাক-১৯৪৭ বঙ্গদেশ, ১৯৪৭-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান থেকে অভিবাসনের ফলে আজ অসমের জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশই অভিবাসী। জনবিন্যাসের এই রূপান্তরের ফলে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অসমিয়া, বোড়ো, কার্বি, ডিমাসা— এদের মধ্যে চরমপন্থী ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। ইসলামি জঙ্গি সংগঠনও অসমে সক্রিয়। বাম-জঙ্গি (বা নকশাল) আন্দোলন, গোর্খা এবং কামতাপুরীদের আন্দোলনও অভিবাসন-প্রসূত। মেঘালয়ে খাসী আন্দোলন এবং অভিবাসন-বিরোধী নীতির ফলে খাসী-বিরোধী আন্দোলনও লক্ষণীয়। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির ক্রমান্বয়িক ব্যর্থতায় অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা ও উগ্রপন্থী আন্দোলন দেখা দেয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন এবং পাকিস্তান শত্রুভাবাপন্ন হওয়ায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সড়ক, রেল ও জলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। দীর্ঘকাল প্রচলিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিপর্যস্ত হয়। শিলিগুড়ি অলিন্দই ভারতের সঙ্গে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একমাত্র যোগসূত্র হিসেবে গড়ে ওঠে। কলকাতার শিল্প এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারত ও বার্মার মধ্যে কৃত্রিম সীমারেখা সৃষ্টির ফলে ওই রেখার দুই দিকে অবস্থানকারী নাগা-কুকি-চীনা- মিজো-মাইতাই (মণিপুরী) গোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। বৃটিশদের চাপিয়ে দেওয়া

পরশুরাম কুণ্ড।

সীমারেখা লঙ্ঘন করে তাদের স্বভূমি একীকরণের দাবি নাগা-মিজো-মাইতাই গোষ্ঠীদের আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছে। বৃটিশরা যখন পছন্দমতো সীমারেখা প্রস্তুত করে, তখন সম্ভাব্য জাতি-দ্বন্দ্ব বা পাহাড়ি বনাম সমতলবাসীর পারস্পরিক বিযুক্তির কথা ভাবেনি। পাহাড়ি উপজাতির মধ্যে যারা রাজনৈতিক ভাবে সচেতন, তারা হিন্দু বা মুসলমান কোনো স্বভূমির অঙ্গীভূত হতে চায়নি বা প্রভাবাধীনও থাকতে চায়নি। অতএব তারা স্বাধীনতার দাবি তোলে ও জঙ্গি আন্দোলন আরম্ভ করে।

বৃটিশদের অগ্রসরমূলক নীতির ফলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (সংক্ষেপে নেফা, বর্তমানে, অরুণাচল) বৃটিশদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে। স্বাধীন ভারত একই নীতি অনুসরণ করায় চীনের সঙ্গে সরাসরি সংগ্রামমুখী অবস্থানে আসে। চীন উপরোক্ত অঞ্চলকে নিজের বলে দাবি করে। রাশিয়ায় ও চীনে সমাজবাদী আন্দোলনের সাফল্য উত্তরপূর্বাঞ্চলের ভারতবিরোধী গোষ্ঠীদের আকৃষ্ট করে এবং চীন এই গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা দেয়। ১৯৫০-এর দশকের শেষে নাগা, মাইতাই এবং তারপর লুশাই (মিজো)-দের উগ্রপন্থী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনগুলি যে দীর্ঘস্থায়ী হয় তার কারণ ছিল : বৈদেশিক সাহায্য, জনগণের সমর্থন এবং সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিরাজমান সরকার-বিরোধী আবহ। চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধ ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধে পরিণত হয়। এই যুদ্ধে চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে পশ্চিমি শক্তিগুলি সাহায্য করে। ফলে, ভারতের অভ্যন্তরে ভারত-বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা করতে চীন অধিকতর দৃঢ়সংকল্প হয়। আবার, ভারতের সঙ্গে বিরোধের জন্য পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান মারফত এই গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা করে। চলমান ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্কে অবনতি ঘটে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের মৈত্রী বন্ধন স্থাপিত হয়। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত-বিরোধী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। একথা বলা যায় যে, যখনই কোনো না কোনো ভাবে চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ ঘটে, তখনই ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

পাকিস্তান এই গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন দিয়েই এসেছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশও একই কাজ শুরু করে। নাগা, মিজো, মাইতাইদের চরমপন্থী আন্দোলনের পর আমরা ত্রিপুরা, অসম, অরুণাচল ও শেষত মেঘালয়ে অনুরূপ আন্দোলন প্রত্যক্ষ করি। সব কয়টি আন্দোলনই ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে।

এতক্ষণ আমরা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থার সারাংশ দিয়েছি। এবারে পৃথক পৃথক রাজ্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

অসম

এই রাজ্যের সমস্ত দিকে কোনো না কোনো উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্য আছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে অসমের লোকসংখ্যা হলো ৩ তিন কোটি ১২ লক্ষ ৫ হাজার ৫৭৬। জনবিভাজন নিম্নরূপ :

হিন্দু ৬৭.১৩%; মুসলমান ২৮.৪৮% (এই মুহূর্তে হয়তো ৩০%); খৃস্টান ২.৪%, বৌদ্ধ ০.৮%; শিখ ১.৯%; বাকি অঘোষিত।

অসমের জাতিগত বিভাজন আরও সূক্ষ্ম ভাবে করা সম্ভব : আর্য ৯%; আহোম ১০%; মুসলমান (১৯০১-এর পূর্বে) ৬%; বোড়ো ইত্যাদি মঙ্গোলীয় উপজাতি ১২%; মণিপুরী ২%; নেপালি ২%; জনজাতি ১৫%; বাংলাদেশি মুসলমান ২২% (সরকারি প্রতিবেদনে অধুনা বলা হয় ২৬-২৮%); বাংলাদেশি হিন্দু ১৭% (৪-৫% কমেও যেতে পারে); ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত শ্রমিক গোষ্ঠী ৩%।

অসমে বহু জনগোষ্ঠী আছে, যারা সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপত্তির জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। বিপুলসংখ্যক অভিবাসীর উপস্থিতি এই বিপত্তির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে; কম হারে হলেও অভিবাসন এখনও চলেছে। ৪০০-৫০০ বছর বা তার চেয়েও পুরানো আদিম অধিবাসীর সংখ্যা বর্তমানে জনসংখ্যার ৪০-৫০%। অতীতে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকলেও ২৮-৩০% মুসলমানদের উপস্থিতি এই প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে। অসম রাজ্যে জনবসতির ঘনত্ব অতিরিক্ত বেশি বলা যায়, কারণ প্রতি বৎসর বন্যায় বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়, জলাভূমিও অনেক। এছাড়া চা-বাগান, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ উৎপাদন কেন্দ্র এবং সর্বোপরি বিপুলায়তন অরণ্য এলাকায় প্রবেশ নিষেধ হওয়ায় খাদ্য ঘাটতি স্বাভাবিক। তদুপরি ঔপনিবেশিক যুগে শোষণমূলক অর্থনীতি অসমে গড়ে তোলা হয়—অর্থাৎ কৃষিদ্রব্য অন্যান্য রাজ্যে রপ্তানি এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে অসমে শিল্পদ্রব্য আমদানি হোত। অসমকে বারবার খণ্ড-বিখণ্ড করে প্রতিবেশী পাহাড়ি রাজ্যগুলি সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গেই অসমের সমস্যা আছে। জনবিন্যাসের পরিবর্তনের আশঙ্কায় এই রাজ্যগুলিতে অসমিয়াদের স্বাগত জানানো হয় না। অসমের প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল, কিন্তু শিল্প নেই। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগসূত্রও ক্ষীণ। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র অসম। কিন্তু সরকারি অবহেলা ও কুশাসনের জন্য কিছু কিছু অংশে সংঘাত ও চরমপন্থী আন্দোলন ঘটেছে। যেসব আন্দোলন অসমে সক্রিয় সেগুলি হলো :

ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (উলফা) : এদের শিবির আছে মিয়ানমারে। ভারতের কিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠীর, যেমন NSCN (K)-র মিয়ানমারে ঘাঁটি আছে। উলফা প্রধানত অসমের ঊর্ধ্ব ও নিম্নাঞ্চলে কাজকর্ম করে; এদের আশ্রয় গারো পাহাড়েও আছে। বাংলাদেশ ও ভুটান এদের

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় উলফার কাজ এখন ধীর গতিতে চলেছে। বাংলাদেশি অভিবাসনই অসমে চরমপন্থী আন্দোলনের মূল কারণ।

বোড়ো আন্দোলন---দি ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব বোড়োল্যান্ড (এন ডি এফ বি) : এদের কিছু শিবির বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও অরুণাচল প্রদেশে আছে বলে সংবাদ পাওয়া যায়। এদের কার্যকলাপ প্রধানত ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে বোড়ো এলাকায় সীমিত। বোড়োদের একটি উপগোষ্ঠী ডিমাসারা উত্তর কাছাড় পাহাড়ি অঞ্চলে উপস্থিত। অসন্তোষের কারণ অভিবাসন-জনিত জনবিন্যাসের পরিবর্তন, সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের অপূর্ণ বাসনা এবং অসমিয়াদের উৎকট আত্মশ্লাঘা। বোড়োরা প্রধানত হিংসাত্মক আক্রমণ দ্বারা বাংলাদেশি ও বোড়ো নয় এমন সব গোষ্ঠীকে বিতাড়নের জন্য সংবাদপত্রে শিরোনাম হয়েছে। অন্যথা, এদের কার্যকলাপ সামান্য।

দক্ষিণ অসমে জাতিদ্বন্দ্ব : দক্ষিণ অসমে কার্বি, দিমাসা ও নাগাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠী আছে। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে সম্বল করে তারা অপহরণ ও বলপ্রয়োগে অর্থ আত্মসাৎ করে। দক্ষিণ অসমে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নাগা, কুকি, মণিপুরী, হমার, কার্বি, ডিমাসা ও বোড়োরা বাস করে, ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগালিম (NSCN) সেটিকে 'বৃহত্তর নাগাল্যান্ড'-য়ের অংশ হিসেবে গণ্য করে। এই দাবিকে বলপূর্বক কার্যে পরিণত করার প্রচেষ্টায় NSCN যে জাতিদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তা কখনও কখনও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হওয়ার বিপদ দেখা দেয়। এছাড়া কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের বঙ্গভাষাভাষী যে যে এলাকায় উচ্চহারে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গিয়া অভিবাসন ঘটেছে, সেসব এলাকা সম্পর্কেও সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ইসলামি জঙ্গিবাদ : বাংলাদেশি অভিবাসীদের ব্যাপক উপস্থিতির ফলে ইসলামি জঙ্গিবাদ শাখা প্রশাখা বিস্তার করছে। বাংলাদেশ থেকে পলাতক জঙ্গিও এদের মধ্যে আছে। এ বিষয়ে গভীর ভাবনাচিন্তা অত্যাবশ্যক।

অসমের সঙ্কট :

চরমপন্থীদের ক্ষেত্রে সরকার-গৃহীত নীতিমালা হলো : সংঘর্ষ বিরতি, সামরিক অভিযান স্থগিত রাখা, বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ ও অস্ত্রত্যাগ। রাজ্যের প্রধান প্রধান বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির প্রায় কারও ক্ষেত্রেই উপরোক্ত নীতিগুলি কার্যকর হয়নি। এই ব্যর্থতার ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, বলপ্রয়োগে অর্থ আদায়, মুক্তিপণ লাভের জন্য অপহরণ ইত্যাদি দৃশ্যমান। এছাড়া, যেসব জাতিগোষ্ঠী অতীতে এই ধরনের লুটপাটে বখরা পায়নি, তারাও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দাবি তোলে। এখন সেজন্য চরম নৈরাজ্য লক্ষ্য করা যায়। তদুপরি, দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার যখন বোড়োদের পৃথক রাজ্য দেওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন সেটাও একটা বাড়তি বিপদের হেতু হয়। বেআইনি অভিবাসন সমস্যার সমাধানে সরকারি ব্যর্থতার জন্য জাতি-সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। বোড়োরা যে সহিংস ব্যবস্থা নিয়ে অভিবাসী বিতাড়নের চেষ্টা করে, সেটাও সরকারি নীতির ব্যর্থতারই উদাহরণ।

ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফশিল অনুসারে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। কিন্তু অসমে যেখানে এসব তফশিল কার্যে পরিণত হয়েছে সেখানেই অবস্থা নিতান্ত ভয়াবহ। অসমে ১০০টিরও বেশি জাতিগোষ্ঠী আছে। এদের প্রত্যেককে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া অসম্ভব। অসমে এখন ৬টি স্বশাসিত জেলা পরিষদ আছে। ১৮টি উন্নয়ন পরিষদ আছে। আরও পরিষদ গঠনের চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো পরিষদই কর্তব্য পালন করতে পারেনি। উপরন্তু, প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী তফশিলি জাতি/উপজাতির সদস্য হতে চাইছে এবং তাদের এই ইচ্ছে পূরণও হচ্ছে। এভাবে একটি রাজ্যের শাসন/ব্যবস্থাপনা হয়ে পড়েছে প্রায় অচল। যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সহমতভিত্তিক রাজনীতি, গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এসব না হলে অসমে হয়তো বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

নাগাল্যান্ড এবং মণিপুর :

এই দুটি রাজ্য নিয়ে যে একত্রে আলাপ-আলোচনা করা অত্যাবশ্যক, সেটা ভারত সরকার ও NSCN(IM)-এর মধ্যে সম্প্রতি সম্পাদিত চুক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে। প্রধানত মণিপুর-ভিত্তিক তাংখুল বিদ্রোহী গোষ্ঠী

অরুণাচল প্রদেশ-চীন সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরায় ভারতীয় সেনা।

NSCN(IM)-কে পরিচালনা করে। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক সঙ্কটের মূলে নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের তথাকথিত নাগা উপজাতিদের সার্বভৌমত্বের জন্য তাংখুলদের সংগ্রাম।

পাটকাই ও নাগা পাহাড়াঞ্চল সন্নিহিত নাগাল্যান্ডে ২০টি উপজাতির বসবাস; এদের মধ্যে প্রধান উপজাতিগুলি মোটামুটি নিম্নপ্রকার :

আংগামী ৯%; চাকেসাং ৮%; চাং ২%; খিয়ামুনিউনশন ২%; কমিয়াক ১৫%; লোথা ৭%; কম ৩%; রেংমা ১.৫%; মাকওয়ারে ০.৫%; শাংতাম ৪%; তিথির ০.৫%; ইমচুংগার ২%; জেলিয়াং ২%; গারো ১%; চির/বোড়ো-কাচারী/কুচি/মিকির (বাংলাদেশি সমেত) অন্যান্য ১৬%।

নানাবিধ পর্যালোচনা থেকে জানা যায় এই উপজাতিগুলির দীর্ঘকাল ধরে ইউনান অঞ্চল থেকে নাগাল্যান্ডে এসেছে। এদের প্রত্যেকটি উপজাতি একাদশ শতাব্দী নাগাদ নাগা পাহাড় গুলির বিভিন্ন এলাকায় পৃথকভাবে বসতি স্থাপন করে। এরা চিরকাল পরস্পরকে শত্রু জ্ঞান করেছে। জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই উপজাতিগুলির মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। তাদের দীর্ঘকাল আচরিত স্বায়ত্তশাসন ও আত্মপরিচিতির ওপর কোনো বিপদের আশঙ্কা ঘটলেই তাদের প্রতিক্রিয়া হয় হিংসাত্মক। বোড়ো, আহোম, মোগল, মণিপুরী, বর্মী (মিয়ানমারি) এবং বৃটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে এসব উপজাতিদের জয় করা অতীব দুরূহ এবং তার ব্যয়ও সাধ্যাতীত। অতএব তারা শান্তিরক্ষার্থে উপজাতিগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং উপজাতিদের স্বশাসন অনুমোদন করে। শুধুমাত্র উপজাতিরা কোনো প্রকারে শান্তিভঙ্গ করলে আহোম, মোগল, বৃটিশ ইত্যাদি শাসকগণ শাস্তিমূলক অভিযান পরিচালনা করতো। তবে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত উপরোক্ত উপজাতিগুলির মধ্যে মস্তক শিকারের প্রথা চালু ছিল।

১৮৭৩ সালে বৃটিশ শাসকেরা 'অভ্যন্তরীণ সীমারেখার নীতি' (ইনার লাইন পলিসি) গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল, উপজাতিদের বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক জাগরণের ছোঁয়া থেকে দূরে রাখা। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে যে স্বশাসনের রীতি প্রচলিত হয় তদনুযায়ী নাগা পাহাড়াঞ্চলের জেলা বর্জিত এলাকা (এক্সক্লুডেড এরিয়া) হিসেবে ঘোষিত হয়। বৃটিশরা নাগাদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার ফলে নাগাদের মধ্যে সাক্ষরতা ও পশ্চিমি জীবনধারার প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাদের মৌলিক মূল্যবোধে পরিবর্তন আসেনি। আত্মপরিচিতির বন্ধনে আবদ্ধ থেকে নাগা উপজাতি সমতলের অধিবাসীদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু এই পদ্ধতিও ফলপ্রসু হয়নি, যেহেতু উপজাতিগুলি (বিশেষত যারা মণিপুর ইত্যাদি এলাকার বাসিন্দা) পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। অথচ, মণিপুরী তাংখুল জঙ্গিবাহিনী NSCN(IM) এর কর্তৃত্বে, এবং এরাই নাগাল্যান্ড-য়ের বিশাল এলাকা বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করে। নাগা উপজাতিদের সংখ্যা ৩৫, এদের মধ্যে ২০টি উপজাতি নাগাল্যান্ডের বাসিন্দা। অন্য নাগারা মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, অসম ও মিয়ানমারে বাস করে। NSCN-এর মতে, নাগা এলাকা শুরু হয় মিয়ানমারের চিন্দুইন নদী থেকে, তারপর এই এলাকা সমগ্র মণিপুর, কাছাড়, উত্তর পাহাড়ি অঞ্চল এবং অরুণাচলের তিরাপ, চাংলাং ও লোহিত জেলা অবধি বিস্তৃত। জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। যেটা অতীব আশ্চর্য্যজনক, এই নাগা উপজাতিগুলির একটিও সাধারণ ভাষা নেই। বিভিন্ন নাগা উপজাতি, এমনকী উপজাতিগুলির বিভিন্ন বর্ণ-গোত্রের ব্যক্তিরাও পরস্পরের সঙ্গে নাগামিজ (অসমিয়া ভাষার একটি রূপ) বা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বৃটিশ প্রশাসনিক নীতিই অবলম্বন করে। অর্থাৎ উপজাতিদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া এবং পৃথক রাখা। অনেকগুলি কারণে উপজাতিদের বিচ্ছিন্নতাবোধ বেড়েই চলল : অপশাসন ও অনুন্নয়ন, অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যের ভাষা হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তনের নিমিত্ত অসম সরকারের প্রকট প্রচেষ্টা এবং শঙ্কাজনক হারে বাংলাদেশি অভিবাসন।

১৯৪৭ সালে অসম সরকারের সঙ্গে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল (NNC)-এর একটি ৯ দফা চুক্তি হয়। এর ফলে উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হলেও তাতে উপজাতিদের আশা পূরণ হয়নি। ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে নাগাদের স্বঘোষিত প্রতিনিধি হিসেবে ফিজো দাবি করে যে ৯৯% স্বাধীনতার পক্ষে। বস্তুত, কেবলমাত্র কোহিমা ও মোকোকচুং-এ জনমত যাচাই হয়েছিল। অংশগ্রহণ ছিল নিতান্তই সীমিত। মহিলারা এবং নাগাল্যান্ডের অন্যান্য এলাকা এই জনমত যাচাই-য়ের বহির্ভূত।

১৯৫৩ সাল থেকে নাগা বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে তিনটি নাগা পিপলস কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়; সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রচেষ্টা চলে। তারা যে ১৬ দফা প্রস্তাব দেয়, ভারত সরকার সেটা মেনে নেয় এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হয়।

এতদসত্ত্বেও চীনা এবং পাকিস্তানি সহায়তায় উগ্রপন্থী নাগাদের কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে। ১৯৭১-এর পরে নিরাপত্তা বাহিনীর সফল পদক্ষেপে কিছু জঙ্গি গোষ্ঠী মিয়ানমারে পলায়ন করে। এরপর চীনের সমর্থন হ্রাস, স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি এবং পাকিস্তান আমলে তৈরি ঘাঁটিগুলি না থাকায় নাগা বিদ্রোহের মাত্রা কমে যায়। উপরন্তু, ১৯৭৫-এ শিলং চুক্তি হয়; NFG ও NNC ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করে ও অস্ত্র সমর্পণ করে। কিন্তু, বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান

অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।

ও তারপর সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর পাকিস্তান, চীন ও বাংলাদেশের সমর্থনে উগ্রপন্থী নাগাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া শিলং চুক্তি-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি NSCN-এর জন্ম দেয়; নাগা চরমপন্থীরা অধিকতর শক্তিশালী হয়। কারণ তারা মিয়ানমারে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে এবং মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতায় রাজি হয়। ১৯৮০-র দশকে আবার জাতিগত কারণে NSCN দ্বিধাবিভক্ত হলে নাগাল্যান্ড এবং মণিপুর, অসম ও অরুণাচলের নাগা এলাকাগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য NSCN-এর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে।

নিরাপত্তা বাহিনীর সক্রিয়তা এবং জনতার চাপে NSCN(IM) নাগাল্যান্ডের সন্নিহিত রাজ্যগুলি এবং বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ডের ঘাঁটিগুলিতে সরে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৯০-এর দশকের শেষে, তারা যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানাতে বাধ্য হয়। ১৯৯৭ থেকে ওই যুদ্ধবিরতি বলবৎ আছে। ওই সময়ে NSCN(K) নাগাল্যান্ড এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির নাগা-অধ্যুষিত এলাকার বৃহদংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। যেমন NSCN(IM)-এর সঙ্গে অনুরূপভাবে NSCN(K) এর সঙ্গেও যুদ্ধবিরতি আয়োজিত হয়। দুই NSCN গোষ্ঠীর প্রতিই যুদ্ধ বিরতি প্রযোজ্য, কিন্তু সরকারিভাবে শুধুমাত্র নাগাল্যান্ডেই তা প্রয়োগযোগ্য ছিল, যেহেতু অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলি বৃহত্তর নাগাল্যান্ডের দাবি মেনে নিতে রাজি ছিলো না। কেবলমাত্র NSCN(IM)-এর সঙ্গে কিন্তু ভারত সরকারের আলাপ-আলোচনা সচল ছিল। হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত সাধারণ মানুষ যুদ্ধ-বিরতির সময়ে শান্তির বার্তা প্রচারে নিয়োজিত থাকে। NSCN গোষ্ঠীগুলি অবশ্য যুদ্ধবিরতির সুযোগে বিভিন্ন এলাকায় নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ সংহত করা, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা জারি রাখে। দিল্লীর সরকারের কাছে গুরুত্ব লাভ করায় NSCN(IM) প্রায় সমগ্র রাজ্যেই ক্ষমতা দখল করে। ব্যতিক্রম ছিল উত্তরপূর্ব নাগাল্যান্ড, যেখানে NSCN(K)-এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। NSCN(K) যুদ্ধবিরতি খারিজ করে দেয়, কারণ তারা উপলব্ধি করে যে NSCN(IM)-ই সরকারের দাক্ষিণ্য-পুষ্ট। পুনরায় নিরাপত্তা বাহিনী ও NSCN(K)-এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মিয়ানমারের সাগাইং জেলা মূলত NSCN(K)-এর ঘাঁটি।

NSCN(K) কিছু সংস্থার সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলেছে : ULFA, NDFB, KLO এবং PLA ; এছাড়াও আরও কোনো কোনো গোষ্ঠী, যারা NSCN(IM)-এর মিত্র নয়, তাদের সঙ্গেও NSCN(K) বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী। কিন্তু NSCN এর দুই গোষ্ঠী বিরোধী জাতিগোষ্ঠীর আন্দোলনের ফলে ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছে। এই সব গোষ্ঠীগুলিরও নানা নাম : NSCN(KK), NSCN U, NSCN R, Zeliang (ZUF) এবং অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠী। এতদসত্ত্বেও, NSCN(K) যুদ্ধবিরতি বাতিল করার ফলে নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচলের তিরাপ ও চাংলাং জেলায় হিংসার মাত্রা বেড়েছে, বলপূর্বক অর্থসংগ্রহ, অপহরণ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংস কার্যকলাপ প্রায় নিয়মিত লক্ষণীয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এন এস সি এন (আই এম) নেতা মুইভা। (ফাইলচিত্র)

মণিপুর : এই রাজ্যটি পাটকাই, নাগা ও মণিপুর পাহাড়ি এলাকার সন্নিহিত। মণিপুরের প্রায় ৭৫% পাহাড়ি অঞ্চল; উপত্যকার চতুর্দিকেই পাহাড়। উপত্যকা

দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭০ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ৩৫ কিলোমিটার। পাহাড়ি উপজাতিরা পাহাড়ে বাস করে; মাইতাই-রা উপত্যকায় অধিষ্ঠিত। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী মণিপুরের জনসংখ্যা ২৫,৭০,৩৯০। জনবিন্যাস নিম্নরূপ :

নাগা— (আও, কাবুই, আঙ্গামী, জেলিয়াং, মাও, তাংখুল—১৩%
কুকি-চীন-আনাল, চিরু চোথে, গাংতে, কইরা, কোম, লামগাং, মিজো, মনেসাং, পাইতে, বালতে, সাটে, সিমটে, থাডু, ভাইফাই)

জেঠ	...	...	...	...	—১৪%
মাইতাই	...	...	...	...	—৫৮%
অন্যান্য (মুসলমান সহ)	...	...	...	...	—১৫%

মণিপুরের সাতটি প্রধান নাগা উপজাতি পরস্পরের শত্রু; তাদের সমগ্র ইতিহাস শত্রুতার ইতিহাস এবং নাগাল্যান্ডের উপজাতিদের কাছেও এদের গ্রহণযোগ্যতা নেই। আও, জেলিয়াং এবং আঙ্গামীরা মণিপুরের সীমানা পেরিয়ে নাগাল্যান্ডেও বাস করে। মণিপুরের অধিবাসী নাগা উপজাতিরা মনে করে যে অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, উন্নয়ন, সংস্কৃতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে মাইতাইরা তাদের অবহেলা করেছে এবং তাদের জমিও মাইতাইরা অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে। অনুরূপভাবে তারা মনে করে যে তাদের জমিতে বলপূর্বক কুকি-চীন উপজাতিদের অধিষ্ঠিত করাও অন্যায়।

কুকি-চীন-মিজো উপজাতিদের অধিকাংশ দক্ষিণ মণিপুরে মিজোরাম-সন্নিহিত চান্দেল ও চুড়াচন্দ্রপুর জেলায় বাস করে। এছাড়া, এই তিন উপজাতি মাও, জেলিয়াং, তাংখুল ও মাইতাই দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেনাপতি জেলার দুটি ক্ষুদ্র অংশে বসবাস করে, আবার ইমফলেও কিছু গোষ্ঠী থাকে। কুকি, হমার, পাইতে, জেঠ, জোমি ও মিজোদের মধ্যে গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। এর একটা প্রধান কারণ হলো মিজোরামে মিজোরা বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। অপরদিকে কুকি-চীন উপজাতিগুলি, যারা মিজো নয়, কিন্তু মিজোরামে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে, তাদের বৃহত্তর মিজোরামের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে। উপরন্তু, তারা নাগাদের এবং মাইতাইদের হাতেও অত্যাচারিত হয়েছে। ফলে কুকি-চীন গোষ্ঠীদের মধ্যে একটি জঙ্গি আন্দোলনের সূচনা অনুভব করা যায়। এই জঙ্গি কুকি-চীন গোষ্ঠীগুলি মিজোসহ অন্য সব জাতিগোষ্ঠীর প্রতিই শত্রুভাবাপন্ন।

মাইতাইরা প্রধানত মণিপুরের উপত্যকায় বাস করে। এই উপত্যকা একদিকে মোরে এবং অপরদিকে অসমের কাছাড় জেলা অবধি বিস্তৃত। এরা অসমের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে নিজেদের উন্নততর মনে করে। তারা এটাও মনে করে যে পাহাড়বাসী উপজাতিদের দাবি পূরণ করতে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এজন্য মাইতাইরা ওই উপজাতিদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। মণিপুর রাজ্যে মাইতাইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। খৃস্টের জন্মের কাছাকাছি সময়ে মাইতাই রাজত্ব উত্তরে ব্রহ্মপুত্র থেকে দক্ষিণে (বর্তমান মিয়ানমারের) চিন্দউইন নদী অবধি বিস্তৃত ছিল। মণিপুরের মূল ভূখণ্ড ছিল তার সমতলভূমি এবং সীমান্ত ছিল পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড়বাসী উপজাতিরা শর্তসাপেক্ষে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত; শর্ত ছিল, শান্তি বজায় রাখতে হবে, এবং মণিপুরের রাজাকে কর দিতে হবে। আর্য সংস্কৃতি বঙ্গদেশে বিস্তৃত হবার পরে মাইতাইরা হিন্দুধর্ম ও বৈদিক সংস্কৃতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে তারা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের অঞ্চলে শক্তিশালী বলে গণ্য হয়। একই সময়ে বোড়ো-কাচারিরা ডিমাপুর থেকে শাসন করত এবং বঙ্গদেশ, ত্রিপুরা ও আহোম অঞ্চলে মোগলরা কর্তৃত্ব করত। মিয়ানমারের নৃপতিগণ রাজ্যবিস্তারের অভিপ্রায়ে বারংবার উপরোক্ত এলাকাগুলিতে অভিযান করে। এছাড়া বোড়ো, কাচারি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উপদ্রবে মণিপুরের জনসাধারণ ও অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। ফলে, মণিপুরীরা পাহাড়ি উপজাতি বা মিয়ানমারি আক্রমণকারীদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হয়। ১৮২৪ সালে তারা বৃটিশদের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। বৃটিশরা মিয়ানমারিদের পরাজিত করে, কিন্তু মণিপুরকে বাধ্য করে মূল্যবান কাবাও উপত্যকা মিয়ানমারকে হস্তান্তর করতে। উপরন্তু, বৃটিশরা দক্ষিণ মণিপুরের চূড়াচন্দ্রপুর ও চান্দেল জেলায় এবং মণিপুরের মধ্যাঞ্চলে কুকি-চীন-মিজো উপজাতিদের বিপুল হারে অভিবাসনে প্ররোচনা দেয়। বৃটিশদের উদ্দেশ্য ছিল, এই উপজাতিগুলি যেন কাছাড়ে বৃটিশদের বাগিচাগুলি ও নাগাদের মধ্যে একটি নিরাপত্তা প্রাচীর বজায় রাখে। এভাবে বৃটিশ ও মণিপুরীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে, ১৮৯১ সালে দুই পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং বৃটিশরা মণিপুর দখল করে নেয়। পরবর্তীকালে জনজাগরণ হয় এবং মণিপুরীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারতের বিভাজনের পর মণিপুরের মহারাজা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। এতে আবার নাগা এবং মাইতাই গোষ্ঠীগুলি জঙ্গি আন্দোলন শুরু করে এবং স্বাধীনতা দাবী করে।

এই পর্যায়ে স্মরণ করা যায় যে মাও জে ডং-এর সমাজবাদী দর্শন যখন সমগ্র পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে প্রভাবিত করে, তখন মণিপুর কমিউনিস্ট পার্টি মিয়ানমারের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমঝোতায় আসে। চীনের সহায়তায় মিয়ানমারের কিছু অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। স্থির হয়, যদি স্বাধীন সমাজবাদী মণিপুর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা চীনের মিত্র হয়, তাহলে মিয়ানমার কাবাও উপত্যকা মণিপুরকে ফিরিয়ে দেবে।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মাইতাইদের দ্বারা শোষণের অভিযোগে মণিপুরস্থ নাগা উপজাতিরা নাগা আন্দোলনে যোগদান করে। অল্পদিন পরে মিজোরামে মিজোদের জঙ্গি আন্দোলন শুরু হয়, অনেক কুকি-চীন-মিজো উপজাতিরা বিক্ষোভ আরম্ভ করে। তাদের দাবি, মণিপুরের কুকি-চীন-মিজো এলাকাগুলি মিজো পাহাড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। উপরন্তু, দক্ষিণ মণিপুরে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য এবং আন্তর্জাতিক সীমানা দিয়ে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য,

কাঠ ও মূল্যবান পাথরের অবৈধ ব্যবসা-চোরাচালান ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব হয়। ১৯৬০-১৯৭০-এর দশকে, মাইতাইদের বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তারা দাবি করে, বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে যে মাইতাই সংস্কৃতি ছিল, তার পুনরুজ্জীবন হবে এবং ভারত থেকে আলাদা হয়ে মাইতাইরা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবে।

ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হলে অনেক জঙ্গিগোষ্ঠী বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনা, কর্মহীনতা এবং চরমপন্থী আন্দোলনের ফলে অবস্থার অবনতি ঘটে। রাজনৈতিক নেতারাও আত্মরক্ষা এবং নির্বাচনে জেতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। সেই থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতাই রীতি হয়ে গেল। প্রশাসনের কাজ দুরূহ হলো। ১৯৭১-এর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর জঙ্গিদের প্রতি পাকিস্তানের সমর্থন অপসৃত হয়। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কাজে সুবিধা হয়। বাহিনীর সাফল্য সত্ত্বেও ১৯৮০-১৯৯০ এর দশকে চরমপন্থী আন্দোলনের পুনরুত্থান ঘটে। তার অনেকগুলি কারণ : প্রশাসনের ভ্রষ্টাচার ও অকর্মণ্যতা, সাধারণ মানুষের হতাশা বৃদ্ধি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ এবং চীন-পাকিস্তান- বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষকতা।

১৯৮৭-৮৮ সালে NSCN দ্বিধাবিভক্ত হয়ে, NSCN(IM)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। NSCN(IM) ছিল তাংখুল উপজাতিদের গোষ্ঠী; মুইভা তার নেতা। ১৯৮০-৯০ এর দশকে মণিপুরস্থ বহু নাগা চরমপন্থী মুইভার সংস্থায় যোগদান করে। বর্তমানে NSCN(IM) মণিপুর ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির নাগা এলাকাসমূহের একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের দাবি ভারত থেকে স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব এবং মণিপুর, অসম অরুণাচল, নাগাল্যান্ড ও মিয়ানমারের নাগা উপজাতি এলাকাগুলির একত্রীকরণ। মাইতাইদের সাথে সংঘর্ষের এটা একটি কারণ। আবার NSCN(IM)-এর সঙ্গে কুকিদের সংঘর্ষের কারণ হলো : পুরুষানুক্রমিকভাবে যা নাগা এলাকা বলে গণ্য সেখানে বলপূর্বক কুকিদের অন্তর্ভুক্তি এবং মিয়ানমারের সঙ্গে মাদকদ্রব্য ইত্যাদির অবৈধ ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণ।

চাকেসাং-য়ের সন্নিহিত এলাকার অধিবাসী অনেক উপজাতি NSCN(IM)-এর বিরুদ্ধপন্থী NFG-র অংশ। ওই এলাকা NFG-র ক্ষমতা কেন্দ্র। NFG আবার NNC থেকে উদ্ভূত। আবার, তামেংলং জেলার Zeliang এলাকাস্থ ZUF হলো NSCN(K)-র সমর্থক।

কুকি-চীন-মিজো উপজাতিরা মনে করে, তাদের নিজ নিজ এলাকায় বৃটিশরাই তাদের প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব, ভারত সরকারের কর্তব্য তাদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে কুকি ও চীন গোষ্ঠী মিজোদের জঙ্গি আন্দোলনকে সমর্থন করে। কারণ তাদের সঙ্গে মিজোদের জাতিগত সাদৃশ্য আছে। তাদের দাবি, মণিপুর-মিজোরামের কুকি-চীন-মিজোদের নিজস্ব এলাকাগুলি থেকে বহিষ্কার করে এবং অনেককে হত্যাও করে। পরবর্তীকালে কুকি-চীন- মিজোরা নিজেদের সংগঠিত করে জঙ্গিগোষ্ঠী গড়ে তোলে, এবং নাগা-মাইতাই ও তাদের উপগোষ্ঠীদের উপদ্রবের প্রত্যুত্তরে আক্রমণও করে। বর্তমানে কুকি-চীন-মিজোরা ভারত সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি করেছে।

কথিত হয় যে বর্তমানে বেশির ভাগ কুকি-চীন গোষ্ঠীর সঙ্গে NSCN(IM)-এর সাময়িক শান্তিচুক্তি হয়েছে। পারস্পরিক সুবিধার জন্য এরা মাইতাইদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে। NSCN(IM) কুকি-চীনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে বৃহত্তর নাগাল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হলেই বৃহত্তর মিজোরামও তৈরি হবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে মৈত্রীভাবাপন্ন কুকি-চীনা গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে NSCN(IM) মাইতাইদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এজন্য তারা পাহাড় এলাকা অবরোধের নকশা প্রস্তুত করেছে, যেহেতু তারা যৌথভাবে ওই এলাকা থেকে মণিপুরে আসার সড়কগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

বর্তমানে ভারত সরকারের সঙ্গে NSCN(IM), কুকি এবং দুটি অবলুপ্ত মাইতাই গোষ্ঠীর একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি আছে। এই চুক্তি প্রথমে নাগাল্যান্ডে প্রযোজ্য ছিল। NSCN(IM)-এর চেষ্টা ছিল, যাতে NSCN(IM)-এর দাবির অন্তর্ভুক্ত সব এলাকাগুলিতে এই চুক্তি প্রয়োগ করা হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধবিরতি বজায় থাকতে থাকতে ওই এলাকাগুলি অর্থাৎ সমগ্র মণিপুর, দক্ষিণ অসমের বৃহদংশ এবং অরুণাচলের তিরাপ, চাংলাং ও লোহিত জেলার ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। প্রারম্ভে ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। কিন্তু এর ফলে মাইতাইরা ব্যাপক আন্দোলন ও সংঘর্ষ শুরু করে এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলি ক্ষুব্ধ হয়। দিল্লীর সরকার তখন বাধ্য হয়ে পূর্বের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।

বর্তমানে NSCN(IM)-এর দাবিকৃত এলাকাগুলিতে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং NSCN(IM) ও তার বশীভূত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি বেসরকারি যুদ্ধবিরতি প্রচলিত আছে। এর মূলে একটি ভীতি সক্রিয়, যুদ্ধবিরতি না থাকলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে! ফলে তাদের দাবির অন্তর্ভুক্ত এলাকায় NSCN(IM) স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। কিন্তু এতে মাইতাই, কুকি-চীন ও NSCN(K) গোষ্ঠীগুলি, এলাকার অধিবাসীরা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি তীব্রভাবে বিক্ষুব্ধ। ভারতর সরকারের সঙ্গে এখন NSCN(K), NSCN(KK), ZUF, NFG, এবং অধিকাংশ মাইতাই বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের কোনো যুদ্ধবিরতি নেই। অতএব এদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর সামরিক

কার্যক্রম চলছে। এছাড়া বলপূর্বক অর্থ আদায়, অপহরণ এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সহিংস কার্যকলাপ নিয়মিত ঘটছে। ভারত-বিরোধী জঙ্গি গোষ্ঠীর অধিকাংশই পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে, মিয়ানমারে ও বাংলাদেশে নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলেছে।

যেসব ভারত-বিরোধী জঙ্গিগোষ্ঠী যুদ্ধবিরতির আওতায় নেই, তাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চলায় তারা অসন্তুষ্ট। উপরন্তু, সমস্যা অধিকতর জটিল হয়, যখন মণিপুরে যাতায়াতের রাস্তাগুলি NSCN(IM) প্রায়শই দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ করে, যাতে মাইতাইরা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। মাইতাইদের মধ্যে বিযুক্তিবোধ ও প্রতারণাজনিত হতাশা তীব্র। কারণ সেনাবাহিনী, পুলিশ, ভারতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা এবং খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে উত্তরপূর্ব অঞ্চল থেকে বৃহত্তম সংখ্যক সদস্য মাইতাই গোষ্ঠীভুক্ত। চরমপন্থী সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত ভারত সরকারের সঙ্গে NSCN(IM)-এর সাম্প্রতিক নাগা চুক্তি বাস্তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটি গুরুতর সঙ্কটের সূচনা করেছে। অথচ, ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল, তারা নাগা উপজাতিদের সঙ্গে এমন কোনো বন্দোবস্ত করবে না যার ফলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির অখণ্ডতা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। নাগাল্যান্ড, মণিপুর, অসম ও অরুণাচলের নাগাগোষ্ঠীগুলি এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর অভিযোগ, তাদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে, কারণ ভারত সরকার শুধুমাত্র তাংখুল নাগাদের সঙ্গে নাগা চুক্তি সম্পাদিত করেছে। তারা এটা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে তাংখুল গোষ্ঠী তাদের শাসন করবে এবং তাদের উপজাতিগত অধিকার ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু ভারত সরকার এই অন্যায় ব্যবস্থাই করেছে। অতএব, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলেই হিংসাত্মক ঘটনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাপ্ত সংবাদ থেকে জানা যায়, NSCN(IM) সম্প্রতি নতুন প্রশিক্ষণ ও কর্ম শিবির স্থাপন করেছে। উদ্দেশ্য, অন্যান্য গোষ্ঠীদের ওপর বলপূর্বক নিজের আদেশ চাপিয়ে দেওয়া। সেজন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। NSCN(IM) দ্বারা বলপূর্বক অর্থ আদায় ও অপহরণ বেড়ে যাচ্ছে। অন্যান্য গোষ্ঠীরাও তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছে, যাতে ভারত সরকার ও NSCN(IM)-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতিরোধ সম্ভব হয়। NSCN(K) এবং তার অনুগামী গোষ্ঠীরা অন্যান্যদের নিজস্ব গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করেছে, যাতে তাদের অধিকতর শক্তিসংগ্রহ হয়। উপরন্তু, মনে রাখতে হবে যে ভারত সকারের বিপুল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মিয়ানমার স্থলসেনা তাদের দেশে NSCN(K) ও তাদের অনুগত গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। মাইতাইরা আবার আত্মরক্ষার্থে তিনটি আইন গ্রহণ করেছে, এগুলি নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত। এর ফলে সম্প্রতি পাহাড়ি উপজাতিগুলি হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। কুকি এবং মাইতাইরা প্রকাশ্যে চরম হিংসা প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করেছে। অসম এবং অরুণাচল সরকারও অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

মেঘালয় : মেঘালয় একটি পাহাড়ি রাজ্য। এর উত্তরে ও পূর্বে অসম আর দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাংলাদেশ। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ২৯,৬৬,৮৮৯। জনবিন্যাস নিম্নরূপ :

খাসি/জয়ন্তিয়া/গারো ... ... —৬৮%
ডিমাসা/হমার/কুকি/কারবি/লাখের/
হাজং/মন/নাগা ... ... —১০%
মিজো ... ... — ৪%
অন্যান্য (বাংলাদেশি ও নেপালি অভিবাসী সহ) প্রায়—১৮%

খাসি, জয়ন্তিয়া ও কারবিদের উৎপত্তি অষ্টিকদের থেকে। গারো, ডিমাসা ও হাজংদের উৎপত্তি বোড়োদের থেকে। ১৮৩৫ সালে বৃটিশরা মেঘালয় অধিকার করে। শিলং তাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখান থেকেই তারা উত্তরপূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। এই এলাকাকে বহির্ভূত এলাকা বলে গণ্য করা হয়নি, একে অসমের সঙ্গে একত্রিত করা হয়। খৃস্টধর্ম প্রবর্তনের মারফত বৃটিশরা উপজাতিদের আধুনিক সভ্যতার আওতায় নিয়ে আসার কাজে আত্মনিয়োগ করে। যেহেতু মেঘালয়ের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না, অতএব ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি ছিল না, যদিও সংস্কৃতিতে খৃষ্টীয় এবং পাশ্চাত্য প্রভাব তারা বজায় রেখেছিল। ১৯৪৯ সালে পৃথক রাজ্যের দাবি প্রথম শ্রুত হয়। ১৯৫২ সালে, অবহেলার অভিযোগে খাসি এবং মিজোরা স্বতন্ত্র উপজাতিগত পরিচিতির দাবি উত্থাপন করে। ১৯৫৭ সালে, এই উপজাতিভুক্ত নয় এমন ব্যক্তি/ গোষ্ঠীকে বহিষ্কার করার আন্দোলন শুরু হয়। সামাজিক বঞ্চনা-জাত হতাশা অসম সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করে। নাগাদের অনুকরণে যুবা গোষ্ঠী দাবি পূরণে জঙ্গি কার্যকলাপ আরম্ভ করে। ১৯৭২ সালে দিল্লীর সরকার তাদের স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দিলে অন্তত আংশিকভাবে সমস্যার সমাধান হয়।

এখন মেঘালয়ে Hynnietrep National Liberation Council (HNLC) নাম নিয়ে একটি খাসি জয়ন্তিয়া জঙ্গি আন্দোলন চলছে। এছাড়া ১২টি গারো চরমপন্থী গোষ্ঠী আছে, যাদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী Garo National Liberation Army (GNLA) ; এদের সঙ্গে ULFA, NSCN(IM), NDFB আছে, তৎসহ রয়েছে চীন ও পাকিস্তানের সমর্থন। এরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতা অথবা ভারতের অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি প্রচার করে। অভিবাসী-বিরোধী ধারণাও প্রবল। অতীতে এই ধারণার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল বাঙালি ও নেপালিরা, বর্তমান খাসিরা অন্য সমস্ত সম্প্রদায়কে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদেরও লক্ষ্যবস্তু করেছে।

গারো-বোড়ো উপজাতিদের সম্বন্ধেও জাতিগত কারণে খাসিদের বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্মেছে। মেঘালয় রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করার প্রস্তাবও উঠেছে। ১৯৯০-এর দশকের শেষে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মেঘালয়ের অবস্থা নিতান্ত অস্বস্তিকর; বলপূর্বক অর্থ আদায় ব্যাপকহারে ও নিয়মিত হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ বাহিনী তাদের

শক্তি পুনরুদ্ধার করেছে এবং অতীতের তুলনায় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে অনেক বেশি সক্ষম। গারো পাহাড় এলাকায় কিন্তু অবস্থার রীতিমতো অবনতি ঘটেছে। অভিবাসী-বিরোধী ও রাজনৈতিক প্ররোচনায় প্রভাবিত খাসি-গারো আন্দোলন সমগ্র মেঘালয়ে চলেছে; ঘনঘন কর্মবিরতি ঘটছে ও সান্ধ্য আইন জারি হচ্ছে।

মেঘালয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর, কিন্তু শিল্পোন্নয়ন হয়েছে অত্যল্প; অতএব, অর্থনৈতিক অবস্থান দরিদ্র। ফলপ্রসূ প্রশাসনের মারফতই সামাজিক-অর্থনৈতিক-জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং উদীয়মান চরমপন্থী আন্দোলনের সমস্যা দূর করা সম্ভব।

মিজোরাম : পাহাড়ি এলাকা মিজোরামের গড় উচ্চতা ৩০০০—৪০০০ ফুট। উত্তরে মণিপুর ও অসম, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ, পূর্বে মিয়ানমার এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী লোকসখ্যা ১০,৯৭,২০৬। জনবিন্যাস নিম্নরূপ :

মিজো/লুসাই	৬০%
পাইতে	৫%
হমার	৫%
রিয়াং	৫%
পই	৫%
লাখের/পাওরি	৮%
চাকমা	৭%
অন্যান্য (বাংলাদেশি-মিয়ানমারী অভিবাসী সহ)...	৫%

উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় মিজোরামের জনবিন্যাসগত সুবিধা হলো এই জনসাধারণ মোটামুটি সমগ্রোত্রীয় : এরা নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে ৭৫% কুকি-চীন-মিজো উপজাতির। আবার, পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারের চীন পাহাড় এলাকা, দক্ষিণ মণিপুর, দক্ষিণ-পূর্ব ত্রিপুরা এবং অসমের সন্নিহিত এলাকাগুলিতেও সমপ্রকৃতির কুকি-চীন- মিজো জাতিগোষ্ঠীরা বাস করে। হিংস্র ও যুদ্ধপ্রিয় হিসেবে মিজোদের স্বাতন্ত্র্য ছিল। একাদশ শতাব্দী নাগাদ মিয়ানমারের চীন পাহাড় থেকে এরা মিজো পাহাড়ে আসে।

গোড়ার দিকে বোড়ো, মণিপুরী ও বৃটিশরা মিজোদের স্বায়ত্তশাসন ভোগের অনুমোদন দেয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিজোরা যখন বারংবার বৃটিশ উপনিবেশ ও বাগিচাগুলিতে আক্রমণ করে, তখনই বৃটিশরা মিজোদের পদানত করে ও মিজো পাহাড়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। তথাপি বৃটিশরা উপজাতিসংক্রান্ত ব্যাপারে মিজোদের স্বশাসন বজায় রাখে। কিন্তু মিজোদের পৃথক রাখার উদ্দেশ্যে বৃটিশরা অভ্যন্তরীণ সীমারেখা (Inner Line) নির্মাণ করে এবং খৃস্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহ দেয়। খৃস্টধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে তাদের ধর্ম ছিল সর্বপ্রাণবাদ এবং উপজাতি-গ্রাম-জমি-স্বশাসন এই আদিম মূল্যবোধ-চতুষ্টয় ভিত্তিক ধ্যানধারনা। খৃস্টধর্ম প্রবর্তনের পরও এই মূল্যবোধে বড় রকম কোনো পরিবর্তন আসেনি। উত্তরপূর্বঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদের প্রতি বিদ্বেষ অটুট। জাতিগত কারণে সমগ্র কুকি-চীন-মিজো এলাকা একত্রিত করে মিজোরা বৃহত্তর মিজোরাম দাবি করেছে। এই কারণে সংখ্যালঘু সমস্যাও মিজোরামে বিদ্যমান, মণিপুরে নিরাপদ আশ্রয় স্থাপন করে হমাররা মিজোরামে উগ্রপন্থী আন্দোলন পরিচালনা আরম্ভ করেছে।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে মিজোরা প্রথমে স্বায়ত্তশাসন ও পরে ভারত থেকে স্বতন্ত্র বৃহত্তর মিজোরামের দাবি উত্থাপন করে। দীর্ঘকাল চরমপন্থী আন্দোলন চলার পর এই দাবি ভারতীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে রূপান্তরিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, অভ্যন্তরীণ সীমারেখা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ-দুষ্ট নীতি অব্যাহত থাকে। তৎসহ কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা, উন্নয়নে ঘাটতি, অপশাসন এবং রাজ্যের ভাষা হিসেবে অসমিয়া ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে অসন্তোষ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৫৯-১৯৬১ সালে মিজোরামে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের অবস্থার উদ্ভব বটে। এই সময়ে জনসাধারণ সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সরকারি সাহায্যের অভাব অনুভব করে। ফলে, ১৯৬১ সালে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (MNF) গঠিত হয়। ১৯৬৬ সালে, MNF-এককভাবে মিজোরামের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং চরমপন্থী আন্দোলন শুরু করে। তারা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার কুকি-চীন উপজাতিদের সাহায্য পায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ভারত সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী অতি দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। ১৯৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হবার পরে ভারতীয় বাহিনী উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। মিজোরাম Union Territory হিসেবে ঘোষিত হয় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রচলনের পর MNF এর জনসমর্থন হারাতে অধিক বিলম্ব ঘটেনি। তখন জঙ্গিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। ১৯৮৭ সালের মিজো চুক্তিতে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। জঙ্গিরা তাদের গোপন আস্তানা ত্যাগ করে প্রকাশ্যে আসে, অস্ত্রসমর্পণ করে, ভারতীয় সংবিধানকে স্বীকৃতি দেয়, স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হয়, মিজো পাহাড়ে শান্তি আসে। সেই সময় থেকে অতি দ্রুত মিজোরামে প্রগতি লক্ষ্য করা যায়। মিজোরাম উত্তরপূর্বাঞ্চলে অন্যতম অতীব শান্তিপূর্ণ রাজ্য হিসাবে গণ্য হয়।

ত্রিপুরা : ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস প্রাচীন। এর পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অংশ অনতিউচ্চ পাহাড়ে ঘেরা। এই অংশগুলি ক্রমশ ত্রিপুরার মধ্য ও উত্তরাংশের সমভূমিতে গিয়ে মিশেছে। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ত্রিপুরার জনসংখ্যা ৩৬,৭৩,৯১৭। জনবিন্যাস এইরূপ :

বোড়োদের থেকে উৎপন্ন ত্রিপুরী উপজাতি ...	১৫%
রিয়াং (ব্রু)	৪%
জামাতিয়া—বোড়োদের থেকে উৎপন্ন গারো-চাকমা-মিজো-কুকি-অস্ট্রিক	৯%
বাঙালী হিন্দু	৬৩%
বাঙালী মুসলমান	৮%
অন্যান্য	১%

বর্তমানে উপজাতিরা মূলত পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে। বাঙালিরা সমতলবাসী। উপজাতিদের মধ্যে বোড়োদের থেকে উৎপন্ন ত্রিপুরী উপজাতিদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। মধ্যযুগে তারা আরাকান, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ অসম এবং আধুনিক ত্রিপুরা এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বৃহৎ রাজ্য গঠন করে। ঐ সময়ে ত্রিপুরীদের শক্তিশালী গণ্য করা হোত। ১৯২১ সাল অবধি জনবিন্যাসে উপজাতিদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যেসব এলাকায় তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যা কম, সেসব এলাকায় ঘনবসতিপূর্ণ পূর্ববঙ্গ থেকে অভিবাসী আমদানীর নীতি বৃটিশরা গ্রহণ করলে ত্রিপুরায় ব্যাপক হারে অভিবাসন ঘটে, যা ১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগ ও তার পরবর্তীকালেও চলতে থাকে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে (প্রাক্তন পূর্ববঙ্গে) পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গণহত্যা করলে ত্রিপুরায় অভিবাসন বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ফলে, উপজাতিদের সংখ্যা প্রায় ২৮% এ নেমে আসে। সাম্প্রতিককালের অভিবাসীদের মধ্যে আছে চাকমারা (৪-৫%) এবং রিয়াংরা (৪%)। চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-আন্দোলনে বাধ্য হলে তাদের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করা হয়। অনুরূপভাবে মিজোরাম সরকার রিয়াংদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। ফলে চাকমা-রিয়াংরা ত্রিপুরায় অভিবাসী হয়।

মাত্রাতিরিক্ত অভিবাসনের ফলে উপজাতিদের আত্মপরিচিতি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হয়, তাদের ঐতিহ্যময় আবাসভূমি থেকে তারা বিতাড়িত হয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনাও তাদের বিক্ষুব্ধ করে। ফলে ত্রিপুরী উপজাতিরা চরমপন্থী আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু রাজ্য সরকারের অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতার ফলে এবং উপজাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নের পথ পরিকল্পিত ভাবে উন্মুক্ত হওয়ায়, চরমপন্থী আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আসে। ত্রিপুরা রাজ্য এখন শান্তিপূর্ণ।

অরুণাচল : উত্তর পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম পাহাড়ি রাজ্য অরুণাচল। পূর্ব হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গ বেষ্টিত এই রাজ্য অসমের উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ১৩,৮৩,৭২৭। একশতেরও বেশি জাতিগোষ্ঠী এখানে বাস করে, তার মধ্যে কুড়িটি প্রধান প্রধান উপজাতি হিসেবে গণ্য। এই কুড়িটি উপজাতির জনবিন্যাস নিম্নরূপ :

আদি (পাদাম, মিনিয়ো, পাসি, পাঙ্গি ইত্যাদি)—এরা সিয়াং, ও দেবাং এর অধিবাসী... ... ... ২৭%
নিশি/দাফলা—সুবনশিরি ও দক্ষিণ কামেং-এর বাসিন্দা ২২%
ওয়াংচু—নাগাদের সমগোত্রীয় জাতিগোষ্ঠীভুক্ত, তিরাপের অধিবাসী ৮%
মনপা—উত্তর কামেং ও তিব্বত সীমান্ত সংলগ্ন কয়েকটি এলাকার অধিবাসী ৮%
মিশমি—লোহিত এলাকাবাসী যারা বোড়ো-নাগা সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতিগোষ্ঠী... ... ... ৭%
নোকটে—তিরাপের অধিবাসী, খানিকটা নাগাদের সমগোত্রীয় ৭%
তাগিন—দক্ষিণ কামেং ও সুবনশিরির কিয়দংশের বাসিন্দা ৬%
তাংসা—তিরাপের অধিবাসী ৪%
আপাতানি—সুবনশিরির অধিবাসী ৪%
মিরি—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ের অধিবাসী ২%
সুলুৎ—পাহাড়ের পাদদেশের বাসিন্দা ১%
খামপ্তি—নাগা-বোড়োদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতিগোষ্ঠী, যারা চাংলাং এর অধিবাসী ১%
অন্যান্য (চাকমা, তিব্বতি, নেপালি, বাংলাদেশি সহ) ৩-৪%

তিব্বতি উদ্বাস্তু ও চাকমা অভিবাসীরা লোহিত ও চাংলাং -এর সমভূমিতে বসবাসের সুযোগ পেয়েছে। মিয়ানমার সীমান্তে বিজয়নগরে নেপালিদের একটি বৃহৎ আবাসস্থল আছে; এটা জয়রামপুরের নিকটবর্তী। জয়রামপুরে বৃটিশ আমলে অসম রাইফলস প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশিরা অরুণাচলের দক্ষিণ প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র এলাকায় বসতি স্থাপন করেছে।

অধিকাংশ জনসাধারণ সর্বপ্রাণবাদী এবং নানা আদিম ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী। অরুণাচলে রামকৃষ্ণ মিশনই প্রথম জনহিতার্থে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান। সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের কাজ সাধারণ মানুষ খুবই পছন্দ করেছে। এই মিশনের ধর্মবিষয়ক কার্যকলাপের কারণে অরুণাচলে বেশ কিছু হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি আছে। তিব্বত থেকে

এক নজরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল

* উত্তর-পূর্বাঞ্চল—অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও অরুণাচল (এছাড়া সিকিম)।
* আন্তর্জাতিক সীমানার দৈর্ঘ্য—৫১০০ কিলোমিটা।
* আয়তন—৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।
* লোকসংখ্যা—সাড়ে চার কোটি (২৫ মিলিয়ন, ২০১১)।
* ৭০ শতাংশই অরণ্য, পাহাড় ও নদী বেষ্টিত।
* শিলিগুড়ি অলিন্দই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাকি ভারতের একমাত্র যোগাযোগের (সড়ক) পথ।
* শিক্ষা—ভারতে উৎপাদিত চা-য়ের ৫০ শতাংশ ও পেট্রোলের ২০ শতাংশ এখানে পাওয়া যায়।
* জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা।
* দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ দ্বার।
* বহুজন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস।

উৎপন্ন উপজাতিগুলি সবাই বৌদ্ধ। খৃস্টান ধর্মযাজকদের জন্য খৃস্টধর্মেরও প্রসার ঘটেছে। অরুণাচলই ভারতের একমাত্র স্থান যেখানে মানুষ সর্বান্তঃকরণে 'উপজাতি-গ্রাম-জমি- স্বশাসন' এই সমন্বিত মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তারা সমবেত প্রচেষ্টায় এই মূল্যবোধ সংরক্ষণে ব্যস্ত।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলনে অরুণাচল ভারতের সাম্প্রতিকতম রাজ্য। বৃটিশরা ১৮৮২ সালে এই এলাকায় অনুসন্ধান শুরু করে। এর মূলে ছিল সীমান্ত প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বৃটিশদের প্রবর্তিত অগ্রসরকামী নীতি। রাশিয়া ও চীন এই নীতির লক্ষ্য। ওই সময়ে অরুণাচলের উপজাতিদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বশাসন নিয়ে বোড়ো এবং আহোমদের কোনো বিরূপ চিন্তা-ভাবনা ছিল না। বৃটিশরা এই এলাকার নাম দিয়েছিল উত্তরপূর্ব সীমান্ত এলাকা। ১৯১৪ সাল নাগাদ বৃটিশরা শাসনভার গ্রহণ করলেও উপজাতিসংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্ণ স্বশাসন দিয়েছিল। এই এলাকাকে বহির্ভূত এলাকা (Excluded Area)-র মর্যাদা দেওয়া হয়। যেহেতু এলাকাটি ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং প্রায় অনাবিষ্কৃত, সেজন্য রাজনীতির ছোঁয়া লাগেনি। স্বাধীন ভারত বৃটিশ নীতি অনুসরণ করে। ১৯৫৪ সালে এলাকাটির নাম পরিবর্তন করে North East Frontier Agency (NEFA) রাখা হয়। চীনের সঙ্গে বিরোধের কারণে ভারতের স্থলসেনাবাহিনী ও অসম রাইফ্‌ল্‌স্ এই এলাকায় প্রবেশ করে। ১৯৫৭ সালে, নাগা বিদ্রোহের জন্য টুয়েনসাং সীমান্ত বিভাগকে নাগা পাহাড় এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টুয়েনসাং-এর অধিবাসীরা ছিল প্রধানত কনিয়াক নাগা উপজাতিভুক্ত।

১৯৬২-এর বিপর্যের পর থেকে ভারতীয় স্থলসেনাবাহিনী সীমান্তের যথাযথ প্রতিরক্ষার নিমিত্ত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৬৭ সালে প্রথম পঞ্চায়েত প্রবর্তিত হয়। ১৯৭২ সালে অরুণাচল প্রদেশকে Union Territory করা হয়। ১৯৮৭ সালে অরুণাচল পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৬০-এর দশক থেকে NSCN উগ্রপন্থীরা দাবি তোলে যে তিরাপ, চাংলাং ও লোহিত জেলার কিছু অংশ নাগালিম -এর অন্তর্ভুক্ত এবং এই জেলাগুলি উগ্রপন্থীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমগ্র এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে NSCN এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বর্তমানে বিরাজমান। উপরোক্ত জেলাগুলির সীমান্ত পেরিয়ে মিয়ানমারে NSCN(K) নিরাপদ আশ্রয়স্থল গড়ে তোলায় এই দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হচ্ছে। উপরন্তু ULFA, PLA, KLO, NDFB, মাওবাদী এবং অন্যান্য মাইতাই জঙ্গি গোষ্ঠীর NSCN(K) আশ্রয় দিয়েছে। এইসব জঙ্গিগোষ্ঠী ঘনঘন উপরোক্ত জেলাগুলিকে অসম, নাগাল্যান্ড ও উত্তরবঙ্গে গমনাগমনের পথ হিসেবে ব্যবহার করে। NSCN(K) এর সঙ্গে সরকারের কোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তি না থাকায় এই এলাকায় সহিংস ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত এই এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জটিলতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো কংগ্রেস দলের হাত থেকে ভারতীয় জনতা দলের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা।

অরুণাচলের বনসম্পদ যেমন বিশাল, তেমনি ব্যাপক অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ এবং বিপুল অব্যবহৃত জলবিদ্যুৎ। সমস্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হলে অরুণাচলের আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণস্বরূপ, অসম এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিক্রয় মারফত অরুণাচল আয় বৃদ্ধি করতে পারে।

উপসংহার : উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার 'পূর্বদিকে কাজ করার' নীতি প্রণয়ন করেছে। এটা অতীতের 'পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত' নীতির রূপান্তর। নীতি রূপায়ণের জন্য এই অঞ্চলে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা জরুরি। ত্রিপুরা ও মিজোরামে কিছুদিন যাবত শান্তি বিরাজমান। তবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু অসম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মেঘালয় সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলে উন্নয়ন সম্ভব নয়, যেহেতু সব কটি রাজ্য ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত। বর্তমান প্রবন্ধে তথ্যভিত্তিক যেসব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে রূপায়িত করা অবশ্যকর্তব্য। অন্যথা, বহু অঞ্চলে, বিশেষত নাগাল্যান্ড ও মণিপুরে, বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সম্পদ যাতে অসৎ রাজনীতিক, প্রশাসক, ব্যবসায়ী ও উগ্রপন্থীদের অপব্যবহারে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না দিলে উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন অসম্ভব। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্য এই অঞ্চলে যে চরম অবনতির সম্ভাবনা প্রতীয়মান সেটা এড়াতে গেলে এবং সেটার সমাধানে পৌঁছোতে হলে বর্তমানে সরকারকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(জয়ন্ত কুমার রায়, ন্যাশনাল রিসার্চ প্রফেসর, গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া)

A
Well
Wisher

১৫ই আগস্ট

উন্নয়নের দিশায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল

নাগাল্যান্ডের হর্নবিল ফেস্টিভ্যালে প্রধানমন্ত্রী।

সুনীল দেওধর

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল আমাদের দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর হওয়ার জন্য ইংরেজরা শিলংয়ে রাজধানী স্থাপন করেছিল। তারা একে অভিহিত করতো 'স্কটল্যান্ড অব ইস্ট' বলে। মেঘের রাজ্য বলে এর এক অংশের নাম মেঘালয়। এখানকার চেরাপুঞ্জী, মৌসিনরাম পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান। অরুণাচলের বোমডিলা, তাবাং সারা পৃথিবীর পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

অসমের মা কামাখ্যা, ব্রহ্মপুত্র নদ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ মাজুলি দর্শন করার ইচ্ছা সবারই থাকে। মণিপুরের মৈরাং সতত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা মনে করিয়ে দেয়, সেখানে তিনি বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক হটিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করেন। সেজন্য ভারতবাসী এখনও মৈরাংকে তীর্থস্থানের দৃষ্টিতে দেখে। ত্রিপুরার শক্তিপীঠ ত্রিপুরাসুন্দরী, উনাকোটি পর্বতগাত্রের মূর্তি, নীরমহল দর্শন করার জন্য দেশবাসী মুখিয়ে থাকে। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর মহাভারতের কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ ডিমাপুরের আদি নাম হিড়িম্বাপুর। সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সমান একাত্ম ছিল।

পুরাকাল থেকেই দেশের এই অংশ জনজাতি বহুল। সহজ সরল এই ভূমিপুত্রদের দেশবিরোধী শক্তি দেশের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত জনজাতিরা পরস্পর রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। ভারতের জনজাতি মানুষের সমস্যা গভীরভাবে অনুধাবন করে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার 'জনজাতি বিকাশ মন্ত্রালয়' গঠন করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখনো মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনজাতি সমাজের মানুষ। এই মন্ত্রালয়ের সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা উত্তর-পূর্ব ভারতকেই দেওয়া হয়েছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা' এবং স্বর্ণালি চতুর্ভুজ যোজনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাকি দেশের সঙ্গে সড়ক পথে যুক্ত করার কাজে এগিয়ে চলেছে। তাঁর 'লুক ইস্ট পলিসি' উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি পুরো দেশের মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে।

উন্নয়নের 'প্রি কন্ডিশন' হলো দেশের আইন ব্যবস্থা ঠিক থাকা। সেজন্য অটলবিহারী বাজপেয়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী গোষ্ঠী যারা জঙ্গিগোষ্ঠী নামে পরিচিত তাদের হিংসা ও অস্ত্র ত্যাগ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর সময়েই প্রথমবার কেন্দ্রে এরকম সরকার এসেছিল যারা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিকাশ চেয়েছিল। তাঁর ওপর আস্থা রেখে বহু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অস্ত্রত্যাগ করে। তার ফলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের ফিরে আসার রাস্তা খুলে যায়। পরিণামস্বরূপ, প্রথম এনডিএ সরকারের সময়ে শান্তিপর্ব শুরু হয় এবং উন্নয়ন আরম্ভ হয়।

দুর্ভাগ্যের কথা, বাজপেয়ী সরকারের পর ইউপিএ-১ এবং ইউপিএ-২-এর আমলে পূর্বতন যোজনা ও উন্নয়নের কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। ভ্রষ্টাচার চরমসীমায় পৌঁছে যায়। ফলস্বরূপ উগ্রপন্থীরা আবার হাতে বন্দুক তুলে নেয়। বাংলাদেশের সীমা সিল করার যে কাজ প্রথম এনডিএ সরকার শুরু করেছিল তা বন্ধ হয়ে যায় এবং আবার দলে দলে অনুপ্রবেশ শুরু হয়ে যায়।

২০১৪ সালে নির্বাচনে দেশবাসী পূর্ণবিশ্বাসে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসায়। সেসময় উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকেও প্রথম ৭ জন সাংসদ নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী হয়েই নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল তাঁর প্রথম তালিকায় এবং তিনি বিশেষভাবে এর উন্নয়ন করতে চান।

নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

যিনি ক্রমাগত ৪ দিন উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করেন। এর ফলে বহু বছর বন্ধ হয়ে থাকা মেঘালয়-অসম রেলওয়ে প্রকল্প ছ' মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করে মেঘালয়কে তিনি রেলমানচিত্রে যুক্ত করেন। নাগাল্যান্ডের ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব 'হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল'-এ প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। ত্রিপুরায় বছরের পর বছর বন্ধ থাকা তালাগণ গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আবার উৎপাদন শুরু করে। মণিপুরের মানুষ খেলাধুলায় বিশেষ রুচি রাখে। সেজন্য প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে 'স্পোর্টস্ ইউনিভারসিটি'-র ঘোষণা করে ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেন।

স্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গরিব পরিবারের আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'ঈশান উদয়' যোজনার অন্তর্গত ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে প্রতিমাসে ৩৪০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা স্কলারশিপ প্রদানের ব্যবস্থা করেন প্রধানমন্ত্রী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তাদের ছুটির সময় সরকারি খরচে দেশের IITs, NITs, IISERs-এ ভ্রমণ করিয়ে সেখানকার ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও কাউন্সিলিং করানো শুরু করা হয়েছে। মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রণালয় এরও নাম দিয়েছে 'ঈশান বিকাশ'।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই খারাপ। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাওয়ার রাস্তা নেই। এসব দেখে ও জেনে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজপথের জাল বোনা হবে। রাজধানী শহরকে যুক্ত করার জন্য ফোর লেন হাইওয়ে এবং ৮৮ জেলা যুক্ত করার জন্য টু লেন হাইওয়ে তৈরি করা হবে। এক বছরে শুধু রাস্তা তৈরি করার জন্য পরিবহণমন্ত্রী নীতীন গড়করি ১০ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমানায় চীন, মিয়ানমার ও বাংলাদেশ অবস্থিত। এইসব দেশে যাতায়াতের রাস্তা তৈরি হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে রাজপথ নির্মাণ শুরু হয়েছে, রেল নেটওয়ার্ক শুরু হয়েছে। সব রাজধানী রেলপথে যুক্ত করা, যেখানে খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেই স্থানও সড়ক ও রেলপথে যুক্ত করা ইত্যাদি যোজনার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এসব যোজনার জন্য কেন্দ্র সরকারের ৫১১৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যে বণ্টিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু ঘোষণা করেছেন ২০১৬ সালের উত্তর- পূর্বাঞ্চলের রেল বাজেটে ৩৫ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার গ্রাম সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে যায়। এর কারণ সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা ঠিক নেই। ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন-এ কেন্দ্র সরকার সংশোধন শুরু করেছে। অরুণাচল ও সিকিম দুর্গম এই দুই রাজ্যের জন্য ৪ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকা এবং অন্য ৬ রাজ্যের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৫১১১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

মোদী সরকারের পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মোট ৬৩,২৫৭ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করার সংকল্প রয়েছে।

এখানকার লোকেরা কৃষিকাজে 'অর্গানিক ফার্মিং' বেশি করেন। এতে আরও উৎসাহ দানের জন্য ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এখানে নানারকমের ফুল পাওয়া যায়। তা কীভাবে রপ্তানি করা যায় সে বিষয়েও কেন্দ্র সরকার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। এখানকার লোকেদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। কিন্তু আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও আধুনিক পদ্ধতিতে করা হয় না। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের কৃষিক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ দেওয়ার জন্য ৬টি নতুন কৃষিবিদ্যাপীঠ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পাহাড়ি এলাকা হওয়ার জন্য দুর্গম। মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া খুবই কঠিন। এজন্য নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টের জন্য 'কম্প্রিহেনসিভ টেলিকম ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান'-এর যোজনায় ৫৩৩৬ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এখানকার ৬টি শহরে ৩টি করে মোট ১৮টি এফ এম চ্যানেল শুরু করার ঘোষণা করা হয়েছে এবং কাজও শুরু হয়েছে। যেখানে নেটওয়ার্ক নেই সেখানে ২-জি কভারেজ ও ন্যাশনাল হাইওয়েতে 'সিমলেস ২-জি' কভারেজের যোজনা রয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি নন

১৫ই আগস্ট

অপারেটিভ এয়ারপোর্ট রয়েছে। সেগুলি চালু করার যোজনা তৈরি হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন এয়ার লাইন্স কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা চলছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জীতেন্দ্র সিংহের তৎপরতার কারণে ইন্ডিগো এয়ার লাইন দিল্লী থেকে ডিমাপুর উড়ান শুরু করেছে।

পর্যটনে উৎসাহ দান করতে পর্যটন স্থানে ছোট বিমান অবতরণের জন্য ছোট এয়ারপোর্ট নির্মাণের যোজনা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে এয়ারপোর্টে রাত্রিকালীন অবতরণের ক্ষমতা উন্নত করার কাজ চলছে। ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি ও আগরতলা শহরে বাণিজ্যহাব করার যোজনা রয়েছে। ফুল ও ফল যাতে তাড়াতাড়ি খারাপ না হয়ে যায় তার জন্য এয়ারপোর্টের কাছে কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ করা হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটন ও সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রণালয় 'নথইস্ট সার্কিট'-কে ১২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। মাজুলি দ্বীপ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ, যা নদীর মধ্যে অবস্থিত। এটি অসমের ঐতিহ্যও বটে। শ্রীমদ্ শঙ্করদেব এখানে তপস্যা করেন এবং 'সত্র' (আশ্রম) পরম্পরা শুরু করেন। এই দ্বীপের উন্নয়নের জন্য ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। শক্তিপীঠ কামাখ্যার জন্য দেওয়া হয়েছে ৫ কোটি টাকা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'ব্রেড অ্যান্ড বাটার' টুরিজিম-এর বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রক বিশেষভাবে নজর রেখেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প ও সংস্কৃতিকে সারা দেশের সামনে তুলে ধরার জন্য জাতীয় রাজধানী দিল্লীতে এক সুন্দর 'পূর্বোত্তর সঙ্গীত ও নৃত্য' এবং 'ভব্য পূর্বোত্তর মহোৎসব'-এর আয়োজন করা হয়। এরকম মহোৎসবের আয়োজন দেশের বড় বড় শহরে করার পরিকল্পনা রয়েছে পর্যটন মন্ত্রকের।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবক-যুবতীরা শিক্ষাগ্রহণের জন্য বেশি সংখ্যায় দেশের বড় বড় শহরে যান। এদের থাকার ব্যাপারে খুব সমস্যা দেখা দেয়। বিষয়টি মাথায় রেখে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুন্দর ছাত্রাবাসের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেছে। ব্যাঙ্গালুরু, পুনে এবং মুম্বইয়েও এরকম ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বছরের পর বছর হিমঘরে পড়ে থাকা বাংলাদেশের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময় বিল পাশ করিয়েছেন। এর ফলে সীমান্তবর্তী দু'দেশের মানুষের মধ্যে আনন্দ-উল্লাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা বাস পরিষেবা চালু করায় ত্রিপুরাবাসী বেশি উপকৃত হয়েছে। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে কলকাতায় আসার জন্য আগে দু'দিন লাগতো। এখন ১৪ ঘণ্টায় আসা যাচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে সড়কপথে যুক্ত করার আরও রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রকের রয়েছে। এর ফলে ব্যবসা এবং সাধারণ নাগরিকেরও খুব সুবিধা হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মোদী সরকার তার প্রথম বছরেই বিভিন্ন মন্ত্রকের মাধ্যমে ৫৮ হাজার ৮২১ কোটি টাকা দেয়। যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অঙ্ক।

পরিকল্পনা করা, অর্থপ্রদান করার মধ্যেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বসে নেই। এসব দ্রুত ক্রিয়ান্বয়ন হোক, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হোক এবং কোনোরকম ভ্রষ্টাচার ছাড়াই হোক--- এ বিষয়ে তারা তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে প্রতি ১৫ দিনে একজন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রবাস করছেন। এভাবে ১ মাসে দু'জন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রতিটি রাজ্যে ভ্রমণ করছেন। এর ফলে সমস্ত পরিকল্পনা আশানুরূপ গতিতে চলছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ অনুভব করতে শুরু করেছেন তাঁরাও এই দেশেরই সুসন্তান।

মাজুলি দ্বীপ।

ভগবান তথাগতের মৈত্রীসেতু বনাম চীনের বিদেশনীতি

১৫ই আগস্ট

'আপনি বুদ্ধগয়ায় গেছেন?'

মিয়ানমারের ট্যাক্সিড্রাইভার যদি জানতে পারেন পিছনের সিটে বসে থাকা যাত্রীটি ভারতীয় তাহলে নিশ্চিতভাবে প্রশ্নটা করবেন। যাত্রীটিও অবাক হয়ে লক্ষ্য করবেন তথাগতের সাধনভূমির গল্প শোনার জন্য কতটা উৎসুক হতে পারে মানুষের চোখ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, দু'দেশের মাঝখানে যেখানে স্বয়ং তথাগত সেতুর ভূমিকায় অবতীর্ণ সেখানে ভারত ও মিয়ানমারের বৈদেশিক সম্পর্কে এত টানাপড়েন কেন? কেনই বা মনে হয় মিয়ানমার ভারতের পড়শি হয়েও কাছের নয়। কোথাও একটা দূরত্ব আছে। দোলাচল আছে।

একটু পিছন দিকে যাওয়া যাক। ভারত ও মিয়ানমারের সম্পর্ক কোনোদিনই ভৌগোলিক

আং সান সু কি-র সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সীমা, ধর্ম, রাজনীতি বা সংস্কৃতির নিগড়ে বাঁধা ছিল না। ইংরেজ আমল থেকেই দু'দেশের মানুষের মধ্যে আদানপ্রদানের ভাব বজায় ছিল। তৎকালীন বর্মা (অধুনা স্বাধীন মিয়ানমার) ছিল তরুণ ভারতীয়দের, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয় এবং বাঙালির ভাগ্যান্বেষণের দেশ। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত বাংলা সাহিত্যে তার নিদর্শন মেলে। অন্যদিকে বর্মা থেকেও বহু মানুষ নানা প্রয়োজনে ভারতে আসতেন। এখনও দক্ষিণ ভারতে বর্মা বাজার বা বর্মা কলোনি নামের একাধিক জায়গার কথা শোনা যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়। বর্মা থেকে কলোনি তুলে দিয়ে ইংরেজরাও দেশে ফিরে যায়। বর্মা হল মিয়ানমার। তারপর কয়েক দশক কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে ভারত এবং মিয়ানমার দুটি দেশেরই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আগেকার সেই সম্পর্কটি ধরে রাখা যায়নি। একদিন যা ছিল অন্তরের টানে বাঁধা আজ তাই বাইরের আকর্ষণে শিথিল।

কিন্তু এরকম কেন হলো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সম্প্রতি দিল্লীতে 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড মিয়ানমার : ফ্রন্টিয়ারস অব নিউ রিলেশনশিপ' শীর্ষক একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হলো। উদ্যোক্তা ইন্ডিয়া ফেডারেশন এবং মিয়ানমার ইনস্টিটিউট অব স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ। দু'দেশের সম্পর্কের জটিলতার অবসান করতে আলোচকেরা নানান সুলুকসন্ধান দিয়েছেন। উঠে এসেছে নানা তথ্য।

গত কয়েক দশক ধরেই ভারতের পক্ষে চীনের বিদেশনীতি অনেক আগ্রাসী। যে কারণে প্রতিবেশী দেশগুলিতে সক্রিয়তার নিরিখেও চীন ভারতের তুলনায় এগিয়ে। মিয়ানমারও তার ব্যতিক্রম নয়। মিয়ানমারের আলোচকেরা জানিয়েছেন সে দেশে চীনের দ্রুত বেড়ে ওঠা প্রভাবের কথা। বলেছেন, যখনই দরকার হয় চীনকে পাওয়া যায়। যদিও চীনের সাহায্য মূলত মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা এবং প্রশাসনিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। অন্তত এখনও পর্যন্ত। মিয়ানমারের সাধারণ মানুষ চীনের সাহায্যের সুফল এখনও পাননি। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। কারণ দেশ ও জাতির নিরাপত্তা এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় যা সহজেই মানুষের মনকে বশ করে ফেলে। তখন আর এটা মনে থাকে না, আপৎকালীন রক্ষকটি আসলে অন্য কোনো দেশকে বিপদে ফেলার জন্য মিয়ানমারকে ব্যবহার করছে।

এখানে একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সময়ের পলি পড়লেও মিয়ানমারবাসীর সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক এখনও অনেকটাই হৃদয়ের। সব থেকে বড়ো কথা, এই সম্পর্কের পিছনে কোনো গোপন উদ্দেশ্য নেই। অন্যদিকে চীনের কাছে মিয়ানমার শুধু

কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক স্তরে ভারত আর মিয়ানমার বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে গেছে। কিন্তু মিয়ানমারের প্রবীণ মানুষজন এখনও ভারতের কথায় নস্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত হন। নবীন প্রজন্মের সেই সুখস্মৃতি নেই। তাদের কাছে ভারত শুধুই গৌতমবুদ্ধের কর্মভূমি। আর কিছু নয়।

দু'দেশের সম্পর্কের আলোচনায় জয়েন্ট ইনটেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান আর এন রবি অন্য এক দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যাবতীয় জাতিগত এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যার মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন। সেই দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর মূল্যায়ন— ভারত ও মিয়ানমার ছিল একই ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দুটি দেশ। কিন্তু মুঘলরা ভারতের অধীশ্বর হয়ে ওঠার পর দুটি দেশের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। তারপর বৃটিশ আমলে দুটি দেশ আবার কাছাকাছি আসে। একটা কথা ভুললে চলবে না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার আঘাত মিয়ানমার সহ্য করেছিল বলে ভারতের পূর্বপ্রান্তে তেমন আঁচ লাগেনি। দুর্ভাগ্য, এসব কথা ভারতের নবীন প্রজন্ম জানে না। আবার মিয়ানমার থেকে আসা বহু মানুষকে ভারতের আশ্রয় দেবার কথা সেখানকার নবীন প্রজন্ম জানে না।

আলোচকেরা প্রায় সবাই দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়াবার ওপর জোর দেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, বলিউডের হিন্দী ছবি মিয়ানমারের মানুষ পছন্দ করেন। আরও বেশি করে হিন্দী ছবি সেখানে পাঠানো হোক। সাংস্কৃতিক দৌত্যের ভার নিক বলিউড। দু'দেশের প্রাচীন ইতিহাসও উদ্ধার করা দরকার। বহু ঐতিহাসিক তথ্য স্রেফ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। সেইসব হারানো সূত্র খুঁজে বের করে দু'দেশের সম্পর্কের ইতিহাস আবার নতুন করে লেখা দরকার। তবেই নবীন প্রজন্ম প্রকৃত সত্য জানতে পারবে। আরও একটা ব্যাপারে জোর দিয়েছেন আলোচকেরা। মিয়ানমারের নাগরিকেরা যাতে কম খরচে বুদ্ধগয়ায় তীর্থ করতে যেতে পারেন সেটাও দেখা দরকার। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভগবান তথাগতের প্রভাব প্রশ্নাতীত। ভারতের বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি যদি মিয়ানমারের ভক্ত বৌদ্ধদের কাছে সুগম হয়ে যায় তাহলে দূরে সরে যাওয়া মন কাছে আসতে বাধ্য।

সম্পর্কের বাঁধন আরও দৃঢ় করার আর একটি উপায় মিয়ানমারে বাসরত ভারতীয়দের প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে এবং বিভিন্ন সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটে প্রকাশ করা। এই কাজে শামিল করতে হবে ভারতে বসবাসকারী মিয়ানমারের নাগরিকদেরও। এ ব্যাপারে লেখক এবং চিত্র পরিচালকদের বড়ো ভূমিকা আছে বলে মনে করছেন আলোচকেরা। কিন্তু সাহিত্যে বা সিনেমায় তাঁরা কী দেখতে চান? উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জেনারেল আংসাঙের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বোঝাপড়ার কথা। এছাড়া নে উইনের শাসনকালে একাধিক ভারতীয় সম্প্রদায়ের মিয়ানমার থেকে দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন, তাঁদের বন্ধু এবং আত্মীয়বিচ্ছেদ, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঙ্গ হিসেবে মিয়ানমারের প্রাচীন ইতিহাস— বিশেষ করে প্রাচীন পিউ শহরের গৌরবগাথা ইত্যাদিও হতে পারে সাহিত্য এবং সিনেমার বিষয়। শিল্পসাহিত্যে নিজেকে দেখলে বা নিজের শেকড় খুঁজে পেলে দু'দেশের মানুষের সম্পর্ক আরও সহজ হবে, সাবলীল হবে।

আং সান সু কি-র মিয়ানমার এবং নরেন্দ্র মোদীর ভারত আপাতত একে অপরের দিকে তাকিয়ে। দু'জনেই দু'দেশের মানুষের পারস্পরিক নৈকট্য চান। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার সফল। আশা করা যায় মিয়ানমারও তাকে খালি হাতে ফেরাবে না। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের আধিপত্য কায়েম করতে পাকিস্তানই সেরা সহযোগী হয়ে উঠছে

অতিথি কলম

ইন্দ্রাণী বাগচী

কয়েকদিন আগে একটি ছবি দেখে মনে হচ্ছিল সেটি যেন মূক অবস্থায় হাজার কথা বলে চলেছে। চীনের সংবাদমাধ্যম কর্তৃক প্রকাশিত ছবিটিতে চীন ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই প্রথম যৌথভাবে তথাকথিত চীন-পাকিস্তান সীমান্ত পরিদর্শনের মহড়া দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। বিশ্বের ভূগোল সম্পর্কে ন্যূনতম অবহিত যে-কোনো ব্যক্তিই জানেন, যে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে কোনো সীমান্তের অস্তিত্ব নেই। এ ক্ষেত্রে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের যে অংশ ভারত ন্যায্যভাবে নিজের বলে দাবি করে সেই অঞ্চলটিকে বোঝানো হচ্ছে। চীনের Xinjiang প্রদেশের সঙ্গে এই অধিকৃত স্থল সীমানা যুক্ত।

> **“চীন-পাকিস্তান রাস্তা তৈরি হলে চীনা পণ্য খুব সহজেই পাকিস্তান পৌঁছে যাবে। আর হ্যাঁ, অন্যদিক থেকে চীনের বিক্ষুব্ধ মুসলমান অধ্যুষিত Xinjiang প্রদেশে পাকিস্তানের জেহাদি পৌঁছতেও দেরি হবে না।”**

সম্প্রতি কাশ্মীরে ঘটে চলা লাগাতার সংঘর্ষ ও অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে চীন পাকিস্তানের পক্ষেই বিবৃতি দিয়েছে। ভাবটা এমন যে পাকিস্তান বোধ হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। চীনা পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, ‘‘আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। তবে কাশ্মীরের হিংসায় নিহতদের সম্পর্কেও আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা আশা করি ভারতের তরফেও পরিস্থিতির ন্যায়সঙ্গত মোকাবিলা করা হবে। কাশ্মীর সমস্যা একটা অতীত কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি। চীন এ বিষয়ে বরাবরই তাদের অবস্থান পরিষ্কার করে রেখেছে, তারা আশা করে সংশ্লিষ্ট দেশ ও জড়িত মানুষজনই শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান খুঁজে নেবে।” বেশ বেশ!

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ চীন সাগরেও চীন এই একই খেলা খেলছে। সন্তর্পণে বাস্তব ভৌগোলিক পরিস্থিতি অসংশোধনযোগ্য ভাবে বদলে দিচ্ছে। নজর করলে দেখা যাবে পি এল এ (পিপলস লিবারেশন আর্মি)-র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বারবার ভারত সীমান্ত লঙ্ঘন, অন্যায়ভাবে ঢুকে পড়া এসবই অন্যদেশের ভূমিখণ্ডকে নিজের বলে দেগে দেওয়ার অপকৌশলমাত্র। চীন ভেতরে ভেতরে একদিকে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সেই সঙ্গে রাজনৈতিক কূটকৌশল প্রয়োগ করে পাক আধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানেরই অধিকারে এনে দিতে চায়।

সম্প্রতি Centre for China Analysis & Strategy-র বিশেষজ্ঞ জয়দেব রানাডে লিখেছেন, ‘‘CPEC (China Pakistan Economic Co-operation)-এর বকলমে নানান বড় বড় অসামরিক নির্মাণ কাজের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক পরিকাঠামো নির্মাণেও সমান তৎপরতা দেখাচ্ছে। প্রকল্পগুলি মূলত চলছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর, গিলগিট, বালটিস্থান অঞ্চলে। এই প্রক্রিয়ায় তারা পাকিস্তানের কব্জায় থাকা কাশ্মীরের অংশকে এক প্রকার আইনগ্রাহ্য মান্যতাই দিয়ে দিয়েছে যার মধ্যেই রয়েছে উল্লিখিত তিনটি প্রদেশ। আর এর ফলে কয়েক দশক ধরে কাশ্মীর নিয়ে যে ধোঁয়াশা চীন জিইয়ে রেখেছিল তাও কেটে গেছে। তারা কাশ্মীর ইস্যুতে সরাসরি পাকিস্তানেরই দোসর হয়েছে।

চীন ও পাকিস্তানের এই পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি দীর্ঘ মেয়াদিভাবে ভারতের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এই কারণেই ভারতকে সর্বদা দু'দুটি সীমান্তে যুদ্ধ প্রস্তুতি বজায় রাখতে হয়। কেননা সেটাই সামরিক কৌশলের একান্ত অঙ্গ। এর ফলে জাতীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। এ পরিস্থিতি না থাকলে সেই অর্থ দেশের অন্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হতে পারত। বিগত ইউপিএ সরকার চীন সম্পর্কে নরম ধারণা পোষণ করত। সরকারের বিশ্বাস ছিল চীনের ‘লৌহ ভ্রাতৃত্ববোধ’ (যারা চট করে কিছু করে না) নীতিতে ভারত ঠিক চিড় ধরাবে। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানের সরকার সহজে হ্যান্ডেল করা যায়— এমনটাই ধরে

নিয়েছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন বিষয়টা তখনও সম্ভব ছিল না এখনও নয়।

বলে দিতে হয় না চীন একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে চলেছে। ২০১০ সালে কাশ্মীরিদের চীনে যাওয়ার জন্য stapled visa নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে যে শোরগোল পড়েছিল তার মধ্যেও এই দুরভিসন্ধি সুপ্ত ছিল। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কিছু জায়গায় চীন লাল পতাকাও তুলে দিয়েছিল। এই নিয়ে ভারত প্রত্যাঘাত করে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি বাতিল করে ও একইসঙ্গে সরকারি নথিপত্রে চীনের 'one China' নীতিরও উল্লেখ রেখে দেয়। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষণীয় চীনের মতলবি কর্মকাণ্ড গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই প্রসারিত হয়ে চলেছে। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশ কেউই এই আধিপত্যবাদের বাইরে নয়। প্রশংসনীয়ভাবে ভারত চীনের এই অঞ্চলগুলিতে আধিপত্য আটকাতে প্রতিস্পর্ধী ভূমিকা নিয়েছে। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চীনপন্থী প্রার্থীকে টপকে যেমন মহেন্দ্র রাজাপক্ষে নির্বাচিত হয়েছিলেন ঠিক তেমনি গত সপ্তাহে কাঠমাণ্ডুতে শত চেষ্টাতেও চীনপন্থী কে পি ওলিকে জনতা অপসারণ করে দ্বিতীয়বার প্রচণ্ডকে ক্ষমতাসীন করেছে। চীনের কৌশল সম্পূর্ণ ভেস্তে গেছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ভূমিকাও নজরে পড়ার মতো। তারা সোনাদিয়ায় চীনকে বন্দর করার অনুমতি না দিয়ে অদূরে মাতাবারি অঞ্চলে জাপানকে আরও একটি বন্দর নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে। আর ভারতীয় সংস্থাগুলি তো আগে থেকেই 'পায়রা' ও 'চট্টগ্রাম' বন্দরের উন্নয়নের কাজে লিপ্ত রয়েছেই। পরিস্থিতি বিচার করে দেখা যাচ্ছে এখন পাকিস্তানই চীনের মুকুটে সেরা রত্ন। আমেরিকা পাকিস্তানের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই নতুন বন্ধু হিসেবে পাকিস্তান চীনের কোলে ওঠার চেষ্টা করে এবং উঠেও পড়ে। এখন চীন পাকিস্তানে যত টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার কতটা অংশ দিয়ে উঠতে পারবে সেটা অন্য ব্যাপার, কেননা অতীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীন প্রতিশ্রুত অঙ্কের খুব বেশি হলে ৬ থেকে ১২ শতাংশই শেষাশেষি দিয়ে থাকে।

তবু আজকের তারিখে চীন-পাকিস্তান একে অপরের স্বার্থ রক্ষায় বহু দূর অবধি যেতে প্রস্তুত। ইউএনএসসি-তে (ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলে) মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করা তারা ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু অন্তিম বিচারে এটি একটি আত্মঘাতী বোঝাপড়া বলেই প্রতিপন্ন হবে, কেননা চীনের Xinjiang প্রদেশে Uighur সম্প্রদায়ের চরমপন্থী মুসলমানরা মাথাচাড়া দিতেই চীন তাদের ওপর ভয়ঙ্কর সব নিষেধাজ্ঞা জারি করে পরিস্থিতি ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে। আশ্চর্যের কথা, এ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারিভাবে টুঁ-শব্দটি করেনি আর চরম জিহাদিরাও নীরব রয়েছে। কেবল হাফিজ সৈয়দ না বললে নয় এমন মিনমিন করছে। অতীতের যে কোনো সময়ের থেকে চীন-পাকিস্তান এখন রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে কাছাকাছি। সিপিইসি-র সুবাদে পাকিস্তান এখন চীনের কাছ থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক মনোনিবেশ পাচ্ছে। চীনের সব রকমের সংস্থার কাছে পাকিস্তান অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। একথা জানিয়েছেন 'The China Pakisthan Axis'-এর লেখক Andresi Small। অতীতে কেবলমাত্র নিরাপত্তার কারণে দু'দেশের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও আজকের ব্যাপক সামরিক-অসামরিক ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলি নিয়ে চীনের গুরুত্ব পাকিস্তানের কাছে অপরিসীম। দক্ষিণ চীন সাগরে বিতর্কমূলক নাকগলানো নিয়ে চীনের পাশেই দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান।

অন্যদিকে বিগত জুন মাসে Nuclear Supplier Group-এর সদস্যপদ নিয়ে ভোটাভুটির আগে ভারতীয় বিদেশ-সচিব এস জয়শঙ্কর চৈনিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সহবাস্থানই বেছে নেয়। অপরপক্ষে চীন ভারতের সভ্যপদের বিরোধিতা না করার শর্ত হিসেবে পাকিস্তানের মতো প্রায় অযোগ্য দেশের সদস্য হওয়া নিয়ে তুমুল ওকালতি চালায়। চীন চাইছে ভারত চীনের 'Belt & Road Initiative' প্রকল্পে যেন কোনো বাধা সৃষ্টি না করে। এটি পূর্বোল্লেখিত সিপিইসি-র পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্গত। এই প্রস্তাবিত বা অর্ধনির্মিত পথ সারা পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ তৈরি করবে। এর খরচ ধরা হয়েছে ৪৬ বিলিয়ন ডলার। ভারত যথাযথভাবেই এর বিরোধিতা করেছে ও চীনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

এর চেয়েও বড় শ্লাঘার কাজ ভারত কিন্তু ইতিমধ্যে সেরে ফেলেছে। ইরানের 'চবার' বন্দর থেকে গ্যাস আমদানির মতো বহু প্রতীক্ষিত প্রকল্পে ভারত সফল হয়েছে। এই সূত্রেই ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী সু-সম্পর্ক প্রয়োজন। ভারত যদি নিজের দেশ থেকে আফগানিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ নাও করতে পারে সেক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে ভারত মধ্য এশিয়া ও ভারত-মঙ্গোলিয়ার সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে। ভিয়েতনাম ভারত থেকে আরও সামরিক সহযোগিতা চাইছে, নিউ দিল্লীর নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসা উচিত। এগুলিই পাল্টা চাপ। আগে বলা হয়েছে চীন-পাকিস্তান রাস্তা তৈরি হলে চীনা পণ্য খুব সহজেই পাকিস্তান পৌঁছে যাবে। আর হ্যাঁ, অন্যদিক থেকে চীনের বিক্ষুব্ধ মুসলমান অধ্যুষিত Xinjiang প্রদেশে পাকিস্তানের জেহাদি পৌঁছতেও দেরি হবে না। ■

১৫ই আগস্ট

জাতীয় জাগরণে রাখিবন্ধন

প্রণব বর

রাখিবন্ধন আজ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে একটি সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এখনও রক্ষাবন্ধনের উপযোগিতা পর্যালোচনা করার আগে আমাদের এই মঙ্গলজনক রক্ষাকর অনুষ্ঠানটির প্রতি একবার আন্তরিক অবলোকন করার প্রয়োজন।

যেন বদ্ধ বলিরাজা দানবেন্দ্রমহাবলঃ।
তেন ত্বামনুবধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল।।

অর্থাৎ, 'যে রক্ষাসূত্রের দ্বারা মহাবলশালী বলীকে আবদ্ধ করা হয়েছিল, আমি তেমনি সূত্রের দ্বারা তোমাকেও বন্ধন করছি, হে রক্ষাসূত্র তুমি চির অচল হয়ে থাকো।' আজও প্রত্যন্ত গ্রামে রাখিবন্ধন উদযাপনের জন্য ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, ছাত্র-যুবা নানা বর্গের মানুষদের পথে নামতে দেখা যাচ্ছে রক্ষাসূত্র হাতে নিয়ে, রক্ষা ও মঙ্গলের সংকল্প নিয়ে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় এমনকী রাজনৈতিক ভাবেও এর প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে একই প্রয়োজনকে সামনে রেখে। কালে কালে সেই অনুষ্ঠানের আচারে রূপে কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থেকে গেছে অপরিবর্তিত।

একবার অতীতের দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন যেখানে রক্ষার উদ্দেশে এমন আচারগুলি পালিত হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র দেবাসুর সংগ্রামে যখন বারবার পরাজিত হচ্ছিলেন তখন পতি ইন্দ্রদেবের হাতে রক্ষাসূত্রের বন্ধন করে তাঁর বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন ইন্দ্রাণী শচীদেবী। তার পরে দানবরাজ বলী যখন ত্রিভুবন পদানত করেছিল, দানের মতো উপায়কে অবলম্বন করে বিজিত সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল, তখন রাষ্ট্র ও সমাজের উদ্ধারক রূপে এগিয়ে এলেন যে নায়ক তিনি বলীর কাছে বামন, অবহেলার পাত্র। দানবগর্বে গর্বিত বলী তাঁকেও দানের দ্বারা তুষ্ট করতে চাইলেন, নিখুঁত রাজনৈতিক চালে সেই বামন তাকে বন্দি করলেন পাতালে। এখানেই এই গল্পের শেষ নয়, আর একটু আছে। তা হলো— বামন বলীর পত্নী দ্বারা রক্ষাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বন্দি বলীকে আনন্দলোকে ফিরিয়ে আনেন। সবাইকে নিয়ে চলা, একীভূত করা, আত্মীকৃত করার সে এক অনন্য নজির। আনন্দের বিষয়, আমাদের পুরাণ বা ইতিহাস বলীকে নায়ক না বানিয়ে বামনকেই ভগবান বিষ্ণুর অবতার রূপে মর্যাদা দিয়েছেন। আর এখানেই রাখির মতো একটি তন্ত্র ও 'যেন বদ্ধ...মা চল'-র মতো একটি অনন্য মন্ত্র আমরা পেলাম। আরও পরে শ্রীরামচন্দ্র ও মাতাসীতার দুই পুত্র লব-কুশ-কে দূর্বা অথবা কুশের দ্বারা বন্ধন করে তাদের রক্ষা সুনিশ্চিত করেন বাল্মীকি। মহাভারতেও মাতা যশোদা, মাতা কুন্তী পুত্রের রক্ষা ও মঙ্গল কামনায় তাদের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। দ্রৌপদী একদিন আহত কৃষ্ণের বাহুতে নিজ বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা বন্ধন করেছিলেন, অপর দিকে কৃষ্ণও দ্রৌপদীকে বিপদে বস্ত্রদান করে রক্ষা করেছিলেন।

শ্রাবণ মাসে বৈদিক ঋষিরা প্রবাস রহিত হয়ে আশ্রমে অবস্থান করেন ও যাগ-যজ্ঞ করতে থাকেন। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে সেই কর্মকাণ্ডের পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হলে বৈদিক ঋষিগণ তাদের শিষ্যদের দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে বেঁধে দিতেন রক্ষাসূত্র। আজও পুরোহিতরা তাঁদের যজমানদের মঙ্গল ও রক্ষা কামনায় পরিয়ে দেন রক্ষাসূত্র শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে। অন্যদিকে, মঙ্গলজনক

কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হতে সঙ্কল্প কালে পুরোহিতরা আজও যজমানকে কুশাঙ্গুরীয়ক অথবা ঘাসের তাগা পরিয়ে দেন। বিপত্তারিণী অথবা মন্দির বা দরগার তাগাগুলিরও ভাবনা রক্ষা ও মঙ্গল বৈ আর কিছু নয়। কেবল এই সাধনটির রূপ পরিবর্তিত হয়েছে, ভাবনা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মোটামুটি একই থেকেছে।

পরাধীনতার কালে সেই প্রাচীন প্রথাটি, আচারটি যেন নতুন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করে। রানি কর্ণাবতীর ঘটনায়— রক্ষার প্রার্থনাতে প্রেরিত হচ্ছে 'রাখি' রাজনৈতিক সহায়ক রাজার কাছে সহায়তা ও রক্ষার প্রার্থনা করে। ইতিহাস আবারও একবার রক্ষাসূত্রের দর্শন করল রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। ১৯০২ সালে শিক্ষাসংস্কার ও রাজ্যগুলির সীমা পুনর্বিন্যাসের দ্বারা, ১৮৫৭-র প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো জাতীয়তাবাদী ঘটনার অনুবর্তনের পথরোধ করাই ছিল রেসলের ষড়যন্ত্রে বাংলা প্রেসিডেন্সি বিভাজন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। সেটা কার্যকর করতে মাঠে নামে কার্জন। প্রবল বিরোধ বক্তৃতা, সভাসমাবেশ সব যেন উপরে উপরে চলছিল, জন-আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল না। এই পরিস্থিতি সামলাতে অবতীর্ণ হলেন কবিগুরু। ১৯০৫-এর অক্টোবরে তিনি রাখিবন্ধনের অকালবোধন করলেন। জাগরণ ঘটালেন জনমানসের। গঙ্গার ঘাট থেকে সেদিন যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তাতে মোটামুটি ভাবে বাঙালি পায়ে-পা মিলিয়েছিল বলা যায়। কণ্ঠে ছিল রাষ্ট্রীয়তার জয়গান। সেই প্রচেষ্টার ফলে কার্জনের সেটেল ফ্যাক্ট আনসেটেল হয়ে গিয়েছিল। স্মরণ করি সেই ঘটনা যেখানে বন্দি বলীকে উদ্ধার করে রক্ষা করা হলো, গ্রহণ করা হলো, আশ্রয় দেওয়া হলো। কারণ আজও আমাদের সামনে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে এক সূত্রে গাঁথতে রক্ষাসূত্রের জুড়ি নেই। ব্যক্তি ব্যক্তিকে রক্ষা করবে, মর্যাদা দেবে, কাছে টেনে নেবে তবেই রক্ষিত হবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র। আমাদের মনীষীরা উচ্চারণ করেছেন 'দেশরক্ষা সমং পুণ্যং দেশরক্ষা সমং ব্রতং। দেশরক্ষা সমং যজ্ঞং দৃষ্টং নৈব নৈব চ'। সত্যই তো দেশরক্ষার চেয়ে বড় পুণ্যব্রত বা যজ্ঞ আর কিছুই নেই। রাষ্ট্ররক্ষার জন্য সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এদেশের সংস্কৃতি সবাইকে ঠাঁই দিয়েছে, আত্মীকরণ করেছে। কখনো পতন এসেছে আবার পুনরুত্থাও হয়েছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রে বলা হয়েছে— 'পশ্চাসন্তং পুরস্কৃদি'— পিছিয়ে পড়েছে যে তাকে এগিয়ে আনো। (ঋক্— ১০.১৭১.৪)। অথর্ববেদের মন্ত্রে বলা হলো— 'উত দেবা অবহিতম্ উন্নয়থা পুনঃ'—দিব্য পুরুষেরা! পড়ে আছে যারা তাদের উন্নয়ন করো (অথ— ১.১০.২)। পণ্ডিত ভীমরাও আম্বেদকরের মতো মহান ত্যাগীকেও অস্পৃশ্যতার পীড়া সহ্য করতে হয়েছে। কর্মের ভিত্তিতে রচিত বর্ণাশ্রম, পতনের কাল থেকে মানতে শুরু করি যে বর্ণাশ্রম জন্মগত, আমরা ভুলে গেছি বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য সমাজের কর্মকুশলতা বর্ধন। বিদ্যাসাগর প্রমুখের মতো মহামানব বর্ণাশ্রমজনিত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

সমাজের যে নিম্নবর্ণকে এতদিন দূরে ঠেলে রেখেছিল সমাজ তাকে কাছে টানতে হবে, যেমন করে শ্রীরামচন্দ্র, নর যাদের বানর বলে দূরে ঠেলে রেখেছিল তাদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। হিন্দবি স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপদের সহযোগী মাদারীকেও শিবাজী মহারাজ তার পছন্দমতো কর্মে নিয়োগ করলেন, কাছে টেনে নিলেন সমাজের শেষ পংক্তির ব্যক্তিকে। আমরা আজও কি আমাদের আশে পাশের সকল সহায়ক ব্যক্তিকে সম্মানের আসন দিয়েছি? নগরে গ্রামে সেবা বস্তিগুলিতে এমন কোনো অভিযান চালিয়েছি কি? নইলে কীভাবে সার্থক করবো বেদের আদেশ— 'জীবনানাং লোকমুন্নয়'— প্রাণীসমূহের সামান্য উন্নয়ন করো (অথ-১.৯.১)।

নারী সমাজের অর্ধেক অংশ, সেই মা-বোনেদের প্রতি আমাদের রক্ষার ভাবনা কি সঠিক ভাবে সজাগ? লাভ জেহাদের করুণ পরিণতি আমরা জানি। সে বিষয়ে আমাদের কাছের বোনটিকে কি সজাগ করেছি? সমাজে সকলের জন্য এমন কোনো সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান চালিয়েছি? বোনকে ভাই রক্ষা করবে কীভাবে, যদি এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন না করা হয়।

বিশ্ব চরাচরে বিদ্যমান প্রতিটি অংশের রক্ষা করতে হবে, তাই 'পরিতঃ আবরণ যা'— সেই পর্যাবরণের রক্ষা করতে হবে। এই সংসারের প্রতিটি জীবের, উদ্ভিদের প্রতি রক্ষার এই ভাবনা আমাদেরও দীর্ঘকাল এই পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখবে। 'মাপো মৌষধী হিংসীঃ'— জল ও বৃক্ষের সঙ্গে হিংসা কোরো না (যজু ৬.২২)— সেই ভাবনা থেকেই জল সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও করতে হবে, পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করতে হবে। খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে বাঁচতে জৈবকৃষির ও গো-সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে। আর সেটা সম্ভব হবে আমাদের সংস্কৃতি রক্ষণের দ্বারা, রাষ্ট্র রক্ষণের দ্বারা। এভাবে বিশ্ব কল্যাণ ও জগৎ কল্যাণ সাধিত হবে। এই ভাবেই রক্ষিত হবে বিশ্ব মানবতা। তখনই রাখিবন্ধনের এই মহান লক্ষ্য সার্থক হবে। যখন এই রক্ষার প্রচেষ্টা— এই সংস্কৃতি জ্ঞানের দ্বারা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে একসূত্রে বাঁধতে সমর্থ হবে, একইভাবে ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে, সমাজকে রাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়তে সমর্থ হবে। ■

সংসদ ভবনের আদি প্রতিকৃতি মিতাওলি

'সমকেন্দ্রিক বৃত্তার ৬৪ কক্ষবিশিষ্ট মিতাওলির যোগিনী মন্দির।' *'An early prototype of House Parliament designed by Lyton early 20th century.*

সৌমেন নিয়োগী

২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে আধুনিক ভারতের সংবিধানের সূচনার সঙ্গে জন্ম হয় এক সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যে মন্দির তা হলো ইংরেজ কর্তৃক নিউ দিল্লীতে লিটন সাহেব দ্বারা নির্মিত সংসদ ভবন যা সকলের কাছে House of Parliament বলে পরিচিত এক অভিনব স্থাপত্য। ১৯ শতকের আশেপাশে নির্মিত বৃত্তাকার এই স্থাপত্যসৌধটি আপামর ভারতবাসীর কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু দিল্লী থেকে খুব বেশি দূরে নয়, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মোরেনা জেলায় চম্বলের গুজ্জরদের বাসস্থানে আমরা দেখতে পাই House of Parliament-এর এক আশ্চর্য প্রতিরূপ। একইরকম বৃত্তাকার স্থাপত্য সৌধ যা মিতাওলি নামক স্থানের 'একোএশো মহাদেব' মন্দির বলে খ্যাত এবং চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির বলেও বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত। যদিও পবিত্র স্থানটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, তথাপি তার অনবদ্য বৃত্তাকার নির্মাণশৈলী ও প্রাচীনত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একে সংসদ ভবনের আদি প্রতিকৃতি

মিতাওলি - ৬৪ যোগিনীর মন্দির।

'একোত্রশো মহাদেব' মন্দির, মিতাওলি।

বলা হলে ভুল হবে না। সঙ্গতভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, Lyton সাহেব হয়তো এইটির অনুপ্রেরণায় House of Parliament নিউ দিল্লীতে নির্মাণ করেন।

মিতাওলির যোগিনী মন্দিরটি একটি টিলা পাহাড়ের উপর অবস্থান করছে, যার বিশাল বৃত্তাকার স্থানটি বিভিন্ন পাথরের সমন্বয়ে গঠিত এবং উপর অংশে ইষ্টক ও চুনাপাথরের কাজ যা সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। বহির্দেওয়ালের বিভিন্ন পর্যায় নির্মাণের সঙ্গে মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরের ঘেরা স্থানটি সমদূরবর্তী স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা অলংকৃত, যার মধ্যে ৬৪টি কক্ষ স্বতন্ত্রভাবে অতি সুন্দর নির্দিষ্ট দ্বার বেষ্টন অলঙ্কারের সঙ্গে অবস্থান করছে। এই একটি কক্ষের মধ্যে যোগীপীঠ-সহ শিবলিঙ্গ রয়েছে, যদিও যোগিনী মূর্তিগুলি নেই। মিতাওলির মন্দিরের প্রবেশদ্বারে একটি স্তম্ভের শিলালেখ থেকে জানা যায়, যে মহারাজ দেবপাল ১৩২৩ বিক্রমসংবতে এটির নির্মাণ করান। কিন্তু শ্রীমতী বিদ্যা দেহজীয়া তাঁর 'YOGINI CULT AND TEMPLES' গ্রন্থে লিখেছেন ১০৫৫- ১০৭৫ A.D. মধ্যে শাসনরত কচ্চপঘাটা বংশীয় রাজা দেবপাল যিনি চান্দেল রাজাদের অপসারণ করে গোয়ালিয়রের স্বাধীন নরপতি রূপে অধিষ্ঠিত হন, তিনিই এই সৌধ নির্মাণ করান। এই শিলালেখ ২৫৪ বছর বাদে মন্দির গঠন হয়ে যাওয়ার পর স্থাপন করা হয়। চোদ্দ শতকে গোয়ালিয়র অঞ্চলে কাচ্চাবাহ রাজপুতদের দাপট ছিল। ফলত যখনই দিল্লীর শাসন সামান্যতম দুর্বল হয়েছে তখন এই বীর রাজপুতরা মুসলমান সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্বের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীন করার প্রয়াস করেছেন। সেই নিরিখে ধরে নেওয়া যায় ১২ শতকের কাচ্চাবাহা রাজাদের হাতে নির্মিত মিতাওলির মন্দিরটি সংরক্ষণের কাজ পরবর্তী যুগে হয়েছে এবং সেই অনুদানেরই কথাই ১৩২৩ A.D. শিলালেখ বহন করছে বলে মনে হয়। সম্ভবত এই সময় বিভিন্ন অলঙ্করণের কাজ মন্দিরটিতে সংযোজিত করা হয়েছে।

মিতাওলির উৎকীর্ণ লিপির সর্বশেষ সংযোজন ১৫০৩ A.D.-তে অর্থাৎ গোয়ালিয়রের শ্রেষ্ঠ নরপতি রাজা মানসিংহের (১৪৯৭—১৫১৭) শাসনকালে, যিনি যুদ্ধে ও শান্তি প্রতিস্থাপনে খুবই সফল এক রাজা। কাজেই উৎকীর্ণ লিপি এটাই প্রতিভাত করে যে ষোড়শ শতকে মুসলমানদের বিভিন্ন বিড়ম্বনা সত্ত্বেও মিতাওলির এই যোগিনী মন্দির সেই সময় এক জনপ্রিয় পূজার স্থান ছিল। পরবর্তীকালে লোকচক্ষুর বাইরে একান্তে দাঁড়িয়ে ঊনিশ শতকের Lyton নির্মিত House of Parliament কে দেখে তার অতীতের স্থাপত্য শিল্পের গরিমাকে অনুভব করার এক প্রয়াস করছে। ■

বন্দে মাতরম্ ও শ্রীঅরবিন্দ

১৫ই আগস্ট

শেখর সেনগুপ্ত

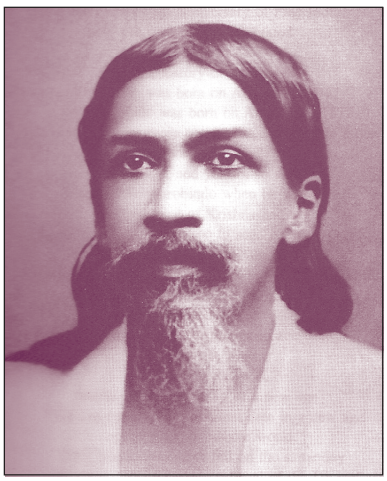

১৯০৬ সনের মার্চ মাস। অরবিন্দ সদলে চললেন বরিশালে কংগ্রেসের অধিবেশনে। জল-জলা-বাদাবনের বরিশাল। তবুও ওখানে স্বাধীনতাকামীরা মূল্যবান দর্শনেরও তাপ পেয়ে যান। অরবিন্দরা যাচ্ছেন খবর পেয়ে সরকার তাড়াহুড়ো করে এখানে ওখানে দাবার বোড়ে সাজাল। জারি হলো নিষেধাজ্ঞা। অরবিন্দ যেন দলবল নিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে ঢুকতে না পারেন। কংগ্রেসের আপোশপ্রিয় সমস্ত নেতার স্বপ্নপূরণের প্রস্তুতি আলাদা— যার সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের তীব্র গতিময় কাঙ্ক্ষিত আঘাত একেবারে বিপরীতমুখী। তাই নিষেধাজ্ঞার গাঁথনি তুলে অরবিন্দকে আটকাবার ব্যবস্থা করেছিল প্রশাসন।

অরবিন্দ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে সভাস্থলের দিকে অগ্রসর হলেন। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের ওপর। অবিরাম নির্বিচার লাঠিচার্জ। রক্তারক্তি। পুলিশ অবশ্য সেদিন অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করেনি। প্রশাসনের আশা ছিল, অরবিন্দ নিশ্চয় আবার বরোদায় ফিরে যাবেন কিছু দিনের মধ্যে। তখন তাঁকে নিয়ে চিন্তার ভাঁজটাও খানিক কমবে।

কিন্তু ততদিনে অরবিন্দ ঘোষ যাতে পাকাপাকিভাবে বাংলাতেই থেকে যান, তা কার্যকরী করতে এগিয়ে এসেছেন আর এক মহৎপ্রাণ, সুবোধ মল্লিক। বিশাল বিত্তবান ব্যক্তি। কিন্তু বিলাসে ও আলস্যে দিন কাটিয়ে ইতিহাসের নিছক পাদপূরণ করবার মতন ব্যক্তিত্ব নন। দেশকে ভালোবাসেন। দেশবাসীকে ভালোবাসেন। নিজের আর্থিক সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে আত্মীয়জনদের পাশাপাশি স্বাধীনতাসংগ্রামীদের উজ্জীবিত করতে চান। অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সেই শ্রদ্ধা ঊর্ধ্বমুখী হয় পি. সি. দত্তের মাধ্যমে সাক্ষাৎ ঘটবার পর। দু'জনের মধ্যে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলে। যে সমস্ত বাঙালি তখনও এক রকম দরকচা মেরে পড়ে রয়েছে, তাদের উদ্দীপ্ত করে তোলার কৌশল বের করতে হবে। দু'জনে প্রায় সমবয়স্ক। চিন্তায় রয়েছে সমতা। সুতরাং অচিরে গড়ে ওঠে তাঁদের দৃঢ় সখ্য।

সুবোধ মল্লিক বললেন, তোমাকে বরোদা ছেড়ে বাংলায় চলে আসতে হবে। তুমিই হবে আগামী দিনের মহীরুহ।

—কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব?

—কলকাতার ল্যান্ডস্কেপে আরও একটি মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলার তোড়জোড় চলেছে। আমিও রয়েছি উদ্যোক্তাদের মধ্যে। যদি তুমি ওই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে রাজি হও, আমি এক লক্ষ টাকা কলেজ তহবিলে দান করব।

—তাহলে তো আমাকে বরোদার রাজ কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়।

—দেবে। দেশমাতৃকাও তাই-ই চায়। তোমাকে হয়তো বরোদার মহারাজার দেওয়া বেতনের সমান মাইনে আমরা দিতে পারব না। তবুও তোমাকে এই দায়িত্ব নিতে হবে দেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে।

—অর্থাভাবের যুক্তি এখানে তুচ্ছ। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হলাম।

—আমরা ধন্য।

সাতশো টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেড়শো টাকা বেতনের কাজে যোগ দিলেন অরবিন্দ ঘোষ। জাতীয় কলেজের চাপ ছিল যথেষ্ট। একটার পর একটা সমস্যা তাঁকে অন্যমনস্ক হবার সুযোগ দিত না। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুচারুভাবে নির্বাহ করেছেন। কখনও নিজেকে মনে করেননি চরিতার্থ। একজন শিক্ষাবিদরূপেও অরবিন্দ ঘোষ যে কত বড় মাপের ছিলেন, আনাচে কানাচে সন্ধান করলে আমাদের এ বিষয়েও সংবিৎ আসবে। অতুলনীয় ভাষাবিদ। একাধিক ভাষার মিশ্রণে যেন নিজের অজান্তেই সংশ্লিষ্ট মুখ্য ভাষাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতেন।

জাতীয় মহাবিদ্যালয় দাঁড়িয়ে গেলে অন্য কয়েকটি সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে অরবিন্দ নিজেকে জড়ালেন। যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল, তাঁদের অনেকে নিজ নিজ মহিমায় ঐতিহাসিক পুরুষ। এদের মধ্যে একজন বিপিনচন্দ্র পাল বহুমুখী প্রতিভা।

অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র পালের ঘনিষ্ঠ হলেন। ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গেও। উপাধ্যায় খুব ভাবগম্ভীর মানুষ। সাহেব তাড়াতে ছুটে আসা হাট্টাকাট্টা তরুণ নন। একটি নরম ও সারগর্ভ সান্ধ্য দৈনিক সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটির নাম 'সন্ধ্যা'। কোথাও কুরুচিকর কিছু দেখলে এ কাগজ যেমন আর্তনাদ করে, তেমনি ভারতবাসীদের সমবেতভাবে স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করতে বলে কিছু প্রতিষ্ঠিত ও ধনী ব্যক্তিকে খানিক হতভম্বও করে দেয়। সকলে হয়তো সমস্বরে কাগজটির সুখ্যাতি করে না, কিন্তু 'সন্ধ্যা'র জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বাড়ছিল বাঙালি পাঠকদের মধ্যে।

কিন্তু অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল বললেন, 'আমাদের এখন দরকার একটি সর্বভারতীয় পত্রিকা। বাংলার উত্তাপকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে দেওয়াটা খুব জরুরি। আক্রমণ কেবল যে সরাসরি হবে তা নয়; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও বিঁধতে হবে

শোষকদের। তবে প্রস্তাবিত এই পত্রিকার ভাষা হতে হবে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি। ইংরেজি ভাষার পাঠক অনেক বেশি। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি সহজতর'।

বিপিনচন্দ্র পাল সভা করে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। এটাও স্থির হলো যে পত্রিকার নাম হবে 'বন্দে মাতরম্'। কিন্তু একটা ভাবনা সকলকেই পীড়া দিচ্ছিল। সর্বভারতীয় পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে অনেক টাকার মূলধন থাকা দরকার। অত টাকা জোগাড় হবে কোন কোন সূত্র থেকে?

সূত্রগুলি অস্পষ্ট।

দু-পাঁচজন তখনই প্রস্তাব নাকচ করে দিতে চান।

আর এক দুর্ভাবনা—নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতমানের লেখা না পেলে প্রস্তাবিত 'বন্দে মাতরম্' অন্য কাগজের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে না।

বিপিনচন্দ্র পালের উৎসাহ অনিঃশেষ।

আর মন দিয়ে লিখলে অরবিন্দ ঘোষের প্রতিটি রচনাই নিশ্চিত হয়ে উঠবে কালোত্তীর্ণ।

বিপিনচন্দ্র পাল পরিচিত অর্ধ-পরিচিত নানা মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছেন। আর অরবিন্দ রাত জেগে খসড়া করে রাখছেন তাঁর পরবর্তী লেখাগুলির।

'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৫ আগস্ট, ১৯০৬। পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল যাঁদের আর্থিক সহায়তায়, তাঁদের মধ্যে বড় দাতা হলেন সুবোধ মল্লিক, বিপিনচন্দ্র পাল, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, নীরদ মল্লিক প্রমুখ। ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে জানানো হলো যে 'বন্দে মাতরম্' বাংলার জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি সংবাদ, তার ব্যাখ্যা এবং অন্যবিধ নিবন্ধাদি গূঢ়জ্ঞান প্রসূত হবে। তাঁরাই এর নৈকট্যে আসবেন, যাঁরা প্রকৃত জাতীয়তাবাদী।

'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল। আবার বিপিনচন্দ্র পালের একান্ত অনুরোধে পত্রিকার সহসম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন অরবিন্দ ঘোষ। আদত কথা হলো, পত্রিকায় অরবিন্দের লেখা যেন নিয়মিত মেলে। অন্যরা যখন হাতড়ে হাতড়ে গুপ্তধনের কাছে পৌঁছয়, অরবিন্দ তখন প্রথমাবধি গুপ্তধনের মাথাতেই বসে আছেন। অরবিন্দ বেশ কয়েকটি নিবন্ধও লিখলেন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার জন্য। অসাধারণ ইংরেজিতে লেখা— যাদের যথার্থ বঙ্গানুবাদ শক্ত কাজ। মনে হয় যেন কোথাও কোথাও সামান্য আবছা-আবছা ভাব বুঝি রয়ে গেল। তথাপি প্রয়াসে ক্ষান্তি না দিয়ে কিছু কিছু নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ এখানে তুলে ধরছি ঃ

বন্দে মাতরম্ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১, ১৯০৬

...পরাধীনতার দূষিত পরিস্থিতির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবার দায়িত্ব নিয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। সেই আবহাওয়া তৈরি হতে পারে নিরন্তর সচেতনতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই বিশাল দেশে পলে পলে তিলে তিলে সঞ্চিত রয়েছে বহু প্রকারের শক্তিভাণ্ডার। কংগ্রেসের দায়িত্ব ছিল ওই সমুদয় শক্তিকে তাদের পতাকাতলে সমবেত করা।

...কিন্তু কংগ্রেস প্রথমাবধি দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যাপকতা প্রদর্শনে ব্যর্থ। সে আত্মপ্রকাশ করে একটি বিশেষ শ্রেণীর দল হিসেবে। তাই সে ক্রমাগতই সরে যাচ্ছে জনগণের কাছ থেকে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও হয়ে উঠছে আপোশকামী। এরা কালক্রমে এই দেশের পক্ষে কতটা কী করে উঠতে পারবে, সেই বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

বন্দে মাতরম্ সেপ্টেম্বর ৪, ১৯০৬

...আমাদের কোনো আনন্দের বাণী নেই। যা আছে তা অগ্নিবাণী। আমাদের হাতে কোনো শ্বেতপতাকা নেই। যা আছে তা বসন্তের কিংশুকের ন্যায় রাঙা। বাংলাকে ভাগ করবার পশ্চাতে যে কুঅভিপ্রায়, তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি বলেই আমাদের প্রতিবাদ এই প্রকার উচ্চকোটির। বাংলাভাষী মানুষদের রাজনৈতিক উত্থানকে চূর্ণ করবার জন্যই এই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছিল। এর অন্য কোনো সরকারি ব্যাখ্যা আমাদের কপালে ফোঁটা পরাতে পারবে না।... এই আন্দোলন যে ব্যাপকতা অর্জন করছে, তা অভূতপূর্ব। এখনও যাঁরা নিজেদের এই আন্দোলন থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে চাইছেন, তাঁদের মানসিকতা আমাদের মর্মাহত করে।

বন্দে মাতরম্ এপ্রিল ১৬, ১৯০৭

...বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরম অবদান এই যে, তিনি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, দেশমাতৃকার স্বরূপকে অনুধাবন করতে। তিনি তো কেবল মহান সাহিত্যিক নন, তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা জহুরি। জন্মভূমির পরিপূর্ণতা বলতে কোনো একটি ভূখণ্ডকে মাত্র বোঝায় না কিংবা কোনো জনসমষ্টি নয়। জন্মভূমির মাহাত্ম্য আরও অনেক-অনেক বৃহৎ অভিধা। যে ব্যক্তির অন্তরে জাতীয়তাবাদ নেই, সে ক্ষুদ্র ও হীন— দয়াময়ের শক্তি-মাধুর্যকে গ্রহণ করবার অবকাশ তার কোথায়? প্রকৃত দেশপ্রেম হলো সেই শক্তি যা সহস্র বিদ্যুৎপাত ঝঞ্ঝাবাতকে তুচ্ছ করে সারা দিনমান অনড় থাকে।...

বত্রিশ বৎসর পূর্বে ঋষি বঙ্কিম তাঁর এই মহৎ সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। খুব কম লোকই এর মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ হয়েছিলেন। তারপর এত বৎসর বাদে আমরা বঙ্গবাসীগণ সত্য ও শক্তির অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'বন্দে মাতরম্'-কে খুঁজে পেলাম। সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার এটাই মহত্তম শক্তি। এখানেই জননী নিজেকে প্রকাশিত করেছেন।...

সুবোধ মল্লিক দরাজ হাতে টাকা ঢালছেন।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার প্রচার ও প্রসার ঝড়ের গতি পেয়েছে। রাজশক্তি বিচলিত ও কুপিত। যে কোনো মুহূর্তে নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া নেমে আসতে পারে। বাংলায় আর যে সমস্ত কাগজ চলছিল, তাদের বিক্রি কমতে থাকে। তাদেরও তাই তারস্বর চিৎকার বন্দে মাতরমের বিরুদ্ধে। ঐতিহাসিক জে. এল., ব্যানার্জী লিখেছেন, 'বন্দে মাতরম্ পত্রিকা দৈনিক হলো। ঝড়ের বেগে সে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলির পায়ের তলা থেকে মাটি সরতে শুরু করেছে। তাদের ত্রাহি ত্রাহি রব। আহাম্মুকের মতন তারা এসে অভিযোগ জানিয়ে যাচ্ছে প্রশাসনকে।

এহেন পত্রিকা যিনিই প্রকাশ করুন না কেন, এর আত্মা ও বাণী যে কার, তা জানি। তিনি শ্রীঅরবিন্দ।'

(শ্রী অরবিন্দের জন্মাদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে আন্দোলন

'পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাতে শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ এখন জরুরি'। স্বস্তিকার ৪ জুলাই, ১৬ সংখ্যার প্রচ্ছদে উপরোক্ত লেখা দেখলাম। আমার মনে হয় শুধু স্মরণ নয় তীব্র আন্দোলন জরুরি। সেটা পশ্চিমবঙ্গেই শুরু করতে হবে। কারণ আজকে আমরা হিন্দুরা বাংলাদেশের হিন্দুদের চাইতে অনেক শান্তিতে আছি, তা বলার অপেক্ষা থাকে না। সেটা একমাত্র শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় হয়েছে।

দেশভাগের সময় জওহরলাল নেহরু পুরো পঞ্জাব ও বাংলা পাকিস্তানকে দিতে তৈরি ছিলেন। তাঁর কাছে ভারতের স্বার্থের চাইতে ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব বেশি জরুরি ছিল। সম্ভবত একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ দাবি করেন নীচের দিকে কোন থানায় হিন্দু বা মুসলমান বেশি আছে সেভাবেই দেশভাগ হোক। তাই হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পঞ্জাব ভারতে থেকে যায়। তা না হলে এই দুই রাজ্যের হিন্দুদের পাকিস্তানে যেতে হোত ও নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হোত।

তাই পশ্চিমবঙ্গবাসীর শ্যামাপ্রসাদের ওই ঋণ শোধ করা বিশেষ দরকার। মমতা এই বিষয়ে আন্দোলন করবেন না, তাতে হিন্দুত্ব জোর পাবে। তা তিনি চাইবেন না। জানি না কেন্দ্র ওই বিষয়ে কতটা আগ্রহী! পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষও নতুন, এ বিষয়ে আমি পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে অগ্রণীর ভূমিকা নিতে অনুরোধ করি।

—হৃষীকেশ কর,
সল্টলেক, কলকাতা।

রোগাক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের শিয়রে মৃত্যুদূত হাজির একথা এখনই বলা না গেলেও এটুকু বলতে সংশয় নেই, তারা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। সেই ব্যাধির নানা লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যথা— তাবিজ, কবচ, গ্রহরত্ন-জ্যোতিষীর ঢালাও মিথ্যা প্রচার ও অফুরান খদ্দের, লটারির রমরমা ব্যবসা, খাদ্যে ও নানাবিধ পণ্যে এমনকী ওষুধেও ভেজালের অস্তিত্ব। আম-সহ অনেক ফলে বিষাক্ত কার্বাইডের যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছেই। বহু বছর যাবৎ এসব অবাধে চলছে। সরকারের ঔদাসীন্যে কিংবা সহযোগিতায় এগুলো বন্ধ হচ্ছে না, যা সমাজের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

আর একটি বেহায়া ব্যাপার ইদানীং নজরে এলো, একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে বেশ কিছুদিন যাবৎ এক ধরনের অদ্ভুত বিজ্ঞাপন যথেচ্ছভাবে দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থা সুন্দরী মহিলাদের বন্ধুত্বকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে ওইসব বিজ্ঞাপন যে লোভনীয় ভাষায় একেবারে খোলাখুলি লিখছে তার একটাই অর্থ — যা ভদ্রভাবে প্রকাশযোগ্য নয়। ভেবে অবাক হচ্ছি, নারীদেহকে পণ্য করার ক্ষেত্র এখন নিষিদ্ধ পল্লী ছেড়ে পত্রিকার খোলা ময়দানে নিয়ে আসার সাহস (পড়ুন নির্লজ্জতা) কেমন করে হলো।

বহু বছর আগে পড়া প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষের 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' প্রবন্ধে আছে— "এই বেকার জীবন, অবিচার বোধ, ব্যর্থতার গ্লানিবোধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ক্রমে বিষিয়ে তোলে। ম্যাইনহাইন বলেছেন, মানুষের যখন লাইফ-প্ল্যান নষ্ট হয়ে যায় তখন তার personal rationalisation বলে কিছু থাকে না এবং ক্রমে সে যাবতীয় miraculous cure-alls এর প্রতি আস্থাবান হয়ে ওঠে।" বর্তমানে সামাজিক প্রেক্ষাপটে কথাগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। মানুষের নীতি ও মনুষ্যত্ববোধ গেলে আর থাকে কী? তখন তাকে তো মৃত্যুপথযাত্রী বলেই মনে হয়।

সুশীল সমাজ ও সরকারের নিকট সচেতনতা ও সক্রিয় আশু পদক্ষেপের বিনীত দাবি রাখছি। আমি এই সমাজেরই একজন এবং বাঁচতে চাই একটা মুক্তবুদ্ধি পরিবেশে আশা নিয়ে।

—কমলাকান্ত বণিক,
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন

১১ জুলাই ২০১৬ সাপ্তাহিক পত্রিকা স্বস্তিকায় 'আয়েষা খাতুনের' লেখা 'ধর্মান্তরিত মুসলমানদের স্বধর্মে ফেরা একান্ত মঙ্গল'— এই কলামটি আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আকর্ষিত করেছে। তাঁর যুক্তিবাদী মনকে একবার সত্যি সালাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমন মুক্তমনা মানুষ যদি পৃথিবীতে তিনভাগের একভাগ থাকতো তবে বসুন্ধরা আর রক্তাক্ত হোত না। তরুণ প্রজন্মের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যেত। ফুলবাগানে ফুলের মতোই সবাই একসঙ্গে বিরাজ করতো। কেন সেটা বুঝতে চায় না সন্ত্রাসকারীরা? অ-মুসলমান ধ্বংস করে তারা কী মনে করছে খুব শান্তিতে বিরাজ করবে? তা কখনো হবার নয়। অধিকার হয়তো কায়েম হবে। তাদের স্বজনবিরোধ বিলক্ষণ বেড়ে যাবে। একদিন কৌলিন্য প্রথার দৌরাত্ম্যে হিন্দু ব্রাহ্মণের কু-প্রথায় পড়ে তাদেরই পূর্বপুরুষ ধর্মান্তরিত হয়েছিল হিন্দু থেকে মুসলমান ধর্মে। তাই 'আয়েষা খাতুনে'র কথা ধরেই বলছি, তাতে লাভ কিছুই হয়নি বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রমশ সমাজের কাছে ঘৃণ্য হয়ে পড়েছে। তাই বলছি এ কাজ যারা করেছে তারা বিকৃত মস্তিষ্ক, দেশদ্রোহী। বর্তমান মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দু। তাদের শিরায় বইছে হিন্দুরক্ত। আয়েষা খাতুন শিক্ষিতা সে কারণে তিনি স্বভাববিনয়ী। কিন্তু মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ গোষ্ঠীকে কেবল বৃহৎ করেছে কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। নিষ্পাপ শিশুগুলোকে কেবল অশিক্ষার অন্ধকারে তলিয়ে রেখেছে। আমার পরিচিত এক মুসলমান তরুণ হিন্দু মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে 'ভারত সেবাশ্রমের' মাধ্যমে। হিন্দু ধর্মে ফিরে এসে বলেছিল, 'আমি খুব

গর্বিত, আবার আমার স্বধর্মে ফিরে এসেছি'। একথা বলেছে কারণ ছেলেটি যথেষ্ট শিক্ষিত। শিক্ষাই পারে অন্ধকারে আলো দিতে। তার সুবিনয়ী স্বীকারোক্তি আমার খুব ভাল লেগেছিল এবং বিবাহ সময়ে আমি সেখানে উপস্থিতও ছিলাম। ছেলেটির উদার বক্তব্যের সঙ্গে খুব মিল পেয়েছি আয়েষা খাতুনের। গুরুত্বপূর্ণ ধারালো যুক্তি। অন্তত দেশের এই দুঃসময়ে এমন সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের খুবই প্রয়োজন।

বস্তুত একথাও ঠিক জোর করে কারও উপর ধর্মের বোঝা বা দায় চাপিয়ে দেওয়া যায় না বা উচিতও নয়। সে যদি স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয় তাহলে ঠিক আছে। এতদিনের প্রচলিত অভ্যাসকে মানুষ ছাড়তে পারে না সহজে। কিছু শিক্ষিত মুসলমান যারা শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে চায়, সমাজকে নতুন করে গড়তে চায় তাদের ভিতর বিরাট ভয় কাজ করছে, উগ্রধ্বংসাত্মক ধর্মের ধ্বজাধারীদের ভয়, মৌলবাদীদের ভয়। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের আবহ থেকে তারা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারেন না। আয়েষা খাতুনের নির্ভীক শুভবুদ্ধিকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়।

—**বেলা দে,**
সামসী, মালদহ।

ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন

''বিজ্ঞানের স্পর্শে ইতিহাসের শাপমুক্তি/সরস্বতীর তীরে হরপ্পার আদি পর্বের সন্ধান'' শিরোনামে তথ্যপূর্ণ নিবন্ধটি (স্বস্তিকা : ১১.৭.১৬) ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রশ্নে অমূল্য। কারণ, গত প্রায় শতাধিক বর্ষ ধরে পাশ্চাত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদদের জ্ঞানে অজ্ঞানে চাপিয়ে দেওয়া আর্য আক্রমণ ও ভারতে অনুপ্রবেশ তত্ত্ব ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার পথে অলঙ্ঘ্য এক বাধার সৃষ্টি করেছিল। গত শতকের চারের দশকের প্রারম্ভপর্বে ছাত্রজীবন থেকে আজ জীবনের প্রায় সায়াহ্ন কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের তথাকথিত আর্য আক্রমণ তত্ত্ব পড়ে, শুনে এবং সেটাকেই প্রায় ধ্রুবসত্য জ্ঞানে মানবজীবন ও সভ্যতা বিচারের চিরন্তন অভ্রান্ত এক মাপকাঠিজ্ঞানে মনে গেঁথে নিয়েছিলাম। কিন্তু একটা অস্বস্তি তাড়া করে চলছিল প্রায় প্রথমাবধি এবং তার কারণ বেদ, পুরাণ সম্বন্ধে মোটামুটি পড়াশুনা ও প্রচলিত ধারণাজাত প্রত্যয় যে এত উত্তুঙ্গ আধ্যাত্মিক চিন্তার কৃতিত্বের অধিকারী কোনো জাতি প্রাচীনত্বের প্রশ্নে অসূয়াপরায়ণ এবং একদেশদর্শী পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রমাণিত অন্যান্য প্রাচীন জড়বাদী সভ্যতার কখনই পশ্চাদ্‌বর্তী হতে পারে না। আর্য-আক্রমণ তত্ত্বের অভ্রান্ততায় বরাবর সন্দিহান বিদগ্ধ ভারতীয় পণ্ডিতদের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলেও স্বামী বিবেকানন্দের 'ওসব আহাম্মকের কথা'-ই প্রত্যয়ের সুদৃঢ় নোঙররূপে কাজ করছিল।

যাইহোক, প্রতিষ্ঠিত সত্য এই যে 'নিঃসন্দেহে ভারত পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশ' এবং এযাবৎ গড়ে তোলা ভ্রান্ত এক তত্ত্ব নস্যাৎ হয়েছে। সত্যের জয় অবধারিত, কেবল সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু মনে হয় এখানেই শেষ নয়। ভারতীয় সভ্যতার সর্বাধিক প্রাচীনতার নিশ্চিত প্রমাণও দিয়েছে বিজ্ঞান যার কাছে মানবসভ্যতার মাত্র নয়, দশ হাজার বছরের বয়সও নেহাৎ শিশুতুল্য। আমেরিকার NASA-র মহাকাশ যানের আধুনিকতম বিশেষ ক্যামেরায় ধরা পড়ে যে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত ত্রিশ কিলোমিটার সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত রামসেতুর বয়স সতের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর। বিজ্ঞানীরা নিবিড় গবেষণান্তে বলেছেন সেতুটি মানুষেরই তৈরি, প্রকৃতির খেয়াল সৃষ্ট নয়। কারণ সেতুটি তৈরি করতে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করেই সাগরের মাঝখান থেকে তৈরি। পাঁচ ছয়শত বছর আগেও ভারত থেকে লঙ্কা সেতুটির উপর দিয়ে হেঁটেই যাওয়া আসা হোত। মাঝে ভূমিকম্পের কারণে জলের কিছু তলায় চলে যায় যা জোরালো ক্যামেরায় অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। শ্রীরামচন্দ্রের ওই সেতু নির্মাণ পাশ্চাত্যের ব্যাখ্যার 'মিথ' বা কবি কল্পনা নয়। 'সত্য' যুগের বয়সও বৈজ্ঞানিক হিসাবে ওই সময়েই নির্দিষ্ট হয়। পৃথিবীর বয়স চারশো কোটি বছর এবং মানবজাতির আবির্ভাব কয়েক কোটি বছর ধরলে রামসেতুর বয়স অবাস্তব মনে হবে না। চীনের গুহায় প্রাপ্ত মনুষ্যদ্বারা পোড়াকাঠের 'ফসিল'-এর বয়স প্রায় তিন কোটি বছর। ভারতের সভ্যতার প্রাচীনত্বের অন্যতম অকাট্য প্রামাণিক সাক্ষ্য পাই মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে জার্মানিতে খননকার্যে প্রাপ্ত একটি নৃসিংহ অবতারের মূর্তি যার বয়স কার্বন ডেটিং এবং অত্যাধুনিক অপ্‌টিক্যাল স্টিমুলেটেড্ লুমিনিসেন্স (ও এস এল) পদ্ধতিতে প্রমাণিত যে হিন্দু পূজিত ওই মূর্তিটির বয়স প্রায় চৌত্রিশ হাজার বছর। আগে এও জানা গেছে যে 'স্বস্তিকা' চিহ্নের বয়স এগারো হাজার বছর এবং ভারত থেকেই এই প্রতীক মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে এটি সিলমোহর আকারে ছিল এবং বেদেও এর উল্লেখ আছে। (স্বস্তিকা : ১৮.৭.১৬)। আবার, গত শতবর্ষের সময়খণ্ডেই প্রাচীনত্বের সঙ্গে ভারত সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকৃত পাশ্চাত্যের দার্শনিক পণ্ডিত দ্বারাই। জার্মান দার্শনিক নীৎশির কথায় : ''We want to make the people of the World Real Men.'' ফ্রেডরিক ভন শ্লীগেল বলেন, ''In India you find the source of all languages, of all thought of the entire history of the human spirit.'' মার্ক টোয়েনের শ্রদ্ধাঞ্জলি : ''This is India, the Cradle of the human racem birth place of human spech, Mother of History, the grand mother of legends, the great grand mother of tradifious.'' 'Wisdom of India'-র লেখক ইউতাং ভারতকে বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

—**অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়,**
তারকেশ্বর, হুগলী।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

শিবিরের একাংশ।

১৫ই আগস্ট

লন্ডনে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিবির

হিন্দু পরম্পরায় বলপূর্বক ধর্মপরিবর্তন নেই : মোহনরাও ভাগবত

সংবাদদাতা।। 'হিন্দু পরম্পরায় বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তনের স্থান নেই। জোর করে ধর্মপরিবর্তন করার অর্থ হলো কোনো ব্যক্তির মানবাধিকার হরণ করা। হিন্দু কোনো সম্প্রদায় নয়, ধর্ম নয়; হিন্দুত্ব হলো এক জীবন পদ্ধতি। হিন্দুত্বে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রলোভন অথবা অন্য কোনো উপায়ে তার সত্তা হরণ করার অনুমতি নেই।' লন্ডনের হার্টফর্ডশায়ারে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ৩ দিনের সংস্কৃতি মহাশিবিরে আগত ২২০০ প্রতিনিধির সামনে কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

উল্লেখ্য, বহু বছর আগে কাজ অথবা পড়াশুনার জন্য ভারত থেকে বিদেশে যাওয়া স্বয়ংসেবকরা হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (HSS) নামে সংগঠন শুরু করেন। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এবং ডেভিড ক্যামেরুণ হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বা বসুধৈব কুটুম্বকমের আদর্শ ও কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

লন্ডন শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে এই শহরে গত ২৯, ৩০ ও ৩১ জুলাই এই সংস্কৃতি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনের শিবিরে সংস্কার, সেবা ও সংগঠন বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা হয়। আগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে শ্রীভাগবত বলেন, 'অতীতে বিদেশি আক্রমণকারীরা বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, ভারতবাসীর ওপর নির্মম অত্যাচার করেছে, তা সত্ত্বেও ভারত কারো সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করেনি। আজও ভারতীয় সমাজ বিশ্বমানবতাকে ধরে রেখেছে। মানবতা ও মানুষকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা হিন্দুদের রক্তের মধ্যেই রয়েছে।' বৃটেনের হিন্দুদের কাছে সরসঙ্ঘচালকজী আবেদন রাখেন, 'বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে।'

উল্লেখ্য, বৃটেনে এখন ১০০টি শাখা চলছে। সংস্কৃতি শিবিরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালেও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বৃটেনের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির স্বামী দয়াত্মানন্দ, লন্ডন সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী নির্লিপ্তানন্দ, সুইজারল্যান্ডের ওঙ্কারানন্দ আশ্রমের আচার্য বৈদ্যভাস্কর উপস্থিত ছিলেন।

শিবিরে উপস্থিত স্বয়ংসেবকদের একাংশ।

শব্দরূপ-৮০০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

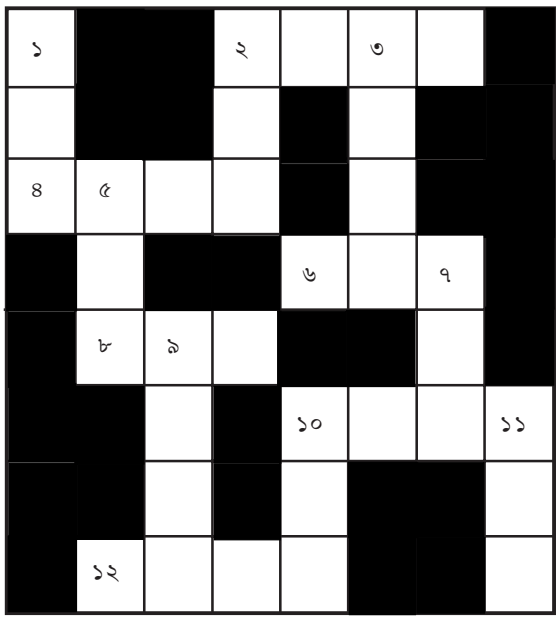

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তক গৌতম ঋষি, ৪. 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই — ', ৬. কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উল্লিখিত ধনপতি সদাগরের প্রথমা পত্নী, ৮. হস্তিচালক, ১০. যশোহর জেলার একটি নদ, যার সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র স্মৃতি জড়িত, ১২. কৃষ্ণ; প্রথম দুয়ে অরণ্য।

উপর-নীচ : ১. শুক্রাচার্য; পরশুরাম, ২. পতিপুত্র-অভিভাবকহীনা রমণী, ৩. অশুভকর গ্রহ, শনি মঙ্গল রাহু ইত্যাদি, ৫. কৃষ্ণসহচর গোপবালক বিশেষ, ৭. অঙ্ক গুণ করার স্মারক তালিকা, ৯. হোমাগ্নি; অগ্নি, ১০. চণ্ডিকা; অগ্নির সপ্তজিহ্বার এক, ১১. চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় জাতি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯৭
সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
রাজীব কুম্ভকার
শালতোড়া, বাঁকুড়া

ঢে	ম	না	■	চ	র্যা	প	দ
র	■	ল	হ	র	■	■	■
■	কা	ক	■	ক	লা	ব	উ
■	ম	■	■	■	■	দ্ধ	■
■	ধে	■	■	■	■	জী	■
কা	নু	ন	গো	■	শি	ব	■
■	■	■	গো	ম	য়	■	দ
পা	ট	কে	ল	■	র	গ	ড়

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮০০ সংখ্যার সমাধান আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

প্রজাতন্ত্রে রাজা ও প্রজার সংঘর্ষ স্থায়ী মনে করে রাজপদ সমাপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রজাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষে প্রজাতন্ত্রের স্থায়ী মান্যতা প্রাপ্ত হয়েছে। সমাজবাদ ধনী ও গরিবের মধ্যে সংঘর্ষকে ভিত্তি করে নিয়েছে। শ্রেণী বদলে গেছে কিন্তু সংঘর্ষ শেষ হয়নি। এর কারণ পাশ্চাত্যের সমস্ত বিচারধারার মূলে বিদ্যমান ডারউইনের জীবন সংগ্রাম (Life Struggle) তত্ত্ব। বিশ্বচরাচর সংঘর্ষের ওপর নয়; সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে টিকে আছে। পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংঘর্ষে নয়; তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সৃষ্টিকার্য সম্ভব হয় এবং বিকশিত হয়। সেজন্য শ্রেণীসংগ্রাম ও সংঘর্ষের স্থানে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতেই সমস্ত কার্যকলাপের বিচার-বিশ্লেষণ ও ভাবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

* * *

ভারতকে ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু সেই ক্ষমতা টিকে থাকে তার ব্যবস্থা কোনোভাবে করা হয়নি। যদিও দেশে একই নাগরিকত্ব এবং কেন্দ্রকে পর্যাপ্ত শক্তি দিয়ে ভারতের একতা সুদৃঢ় করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেই একতার মূলেই কুঠারাঘাত করেছে। শরীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাহার নয়, বরং সেগুলি শরীরেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কল্পনার পরিণাম নিশ্চিতভাবে ভারতের একতার পক্ষে ভয়ঙ্কর হবে এবং দেশে রাষ্ট্রবিরোধী ভাবনা প্রশ্রয় পাবে। রাষ্ট্রীয় ভাবনা হ্রাস হলে রাজ্যগুলির অধিকারের লড়াই কোনো সময় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে। এখন ভাষানুসার প্রদেশ-রচনার দাবির পিছনে এই দুষ্প্রবৃত্তির ঝলক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কল্পনা এক মৌলিক ভুল সিদ্ধান্ত এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৩

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

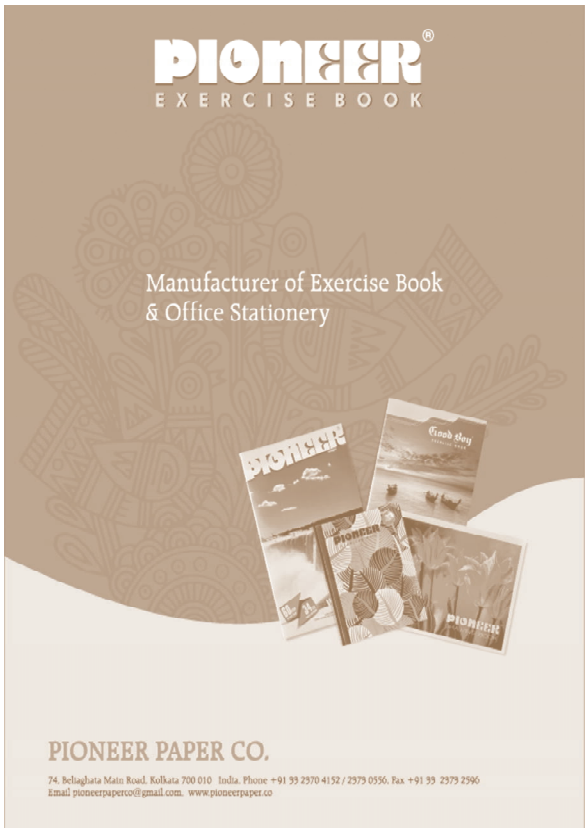

‘ভারতীয় পাঠকের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি কৃপাপূর্ণ, তাঁর স্পর্শ অনন্ত শান্তিময় এবং তাঁর হৃদয় এক অসীম, অনন্ত করুণায় পূর্ণ, ঠিক যেমন পাশ্চাত্যবাসী আমাদের কাছে— যিনি ‘নম্র মেষপালক’ বলে পরিচয় দিতেন, সেই যীশুর দৃষ্টি, হাতের স্পর্শ এবং অতি সুকোমল হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ বলে মনে হয়।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

At Sarda, we believe that forests and plywood can co-exist. Our plywood makes products using only half the volume of sawn timber. We are also FSC certified using timber sourced from only sustainable managed forests.

So the next time you sit on a chair made of our plywood, you will feel more comfortable knowing you have made a small contribution towards saving a forest.

The Forest Friendly Company

OUR BRANDS

DURO TITANIUM LASTS FOREVER
DURO NATURE SIGNATURE PREMIUM VENEERS & PLYWOODS
Durobord INDIA'S NO.1 BLOCK BOARD
DURO TECHPLY PLYWOOD • BLOCKBOARD ENGINEERED TO PERFECTION
DURO Pumaply ALL WEATHER PROOF PLYWOOD
SARDA DUROTEAK TEAK DECORATIVE PLYWOOD
DUROFLEX PREMIUM FLEXIBLE PLYWOOD
DURO TUFFWOOD LVL FRAMES
DURODOOR ELEGANCE HDF MOULDED DOOR

Sarda Plywood Industries Ltd.

Corporate Office:
4th Floor, North Block, 113, Park Street, Kolkata 700016, Phone: (033) 22652274

Toll Free Number
1800-345-3876 (DURO) 10am-6pm/Monday-Friday | E-Mail: corp@sardaplywood.com
www.sardaplywood.in www.facebook.com/duroplyindia